জুল ভার্নের

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস

রূপান্তর: শামসুদ্দীন নওয়াব

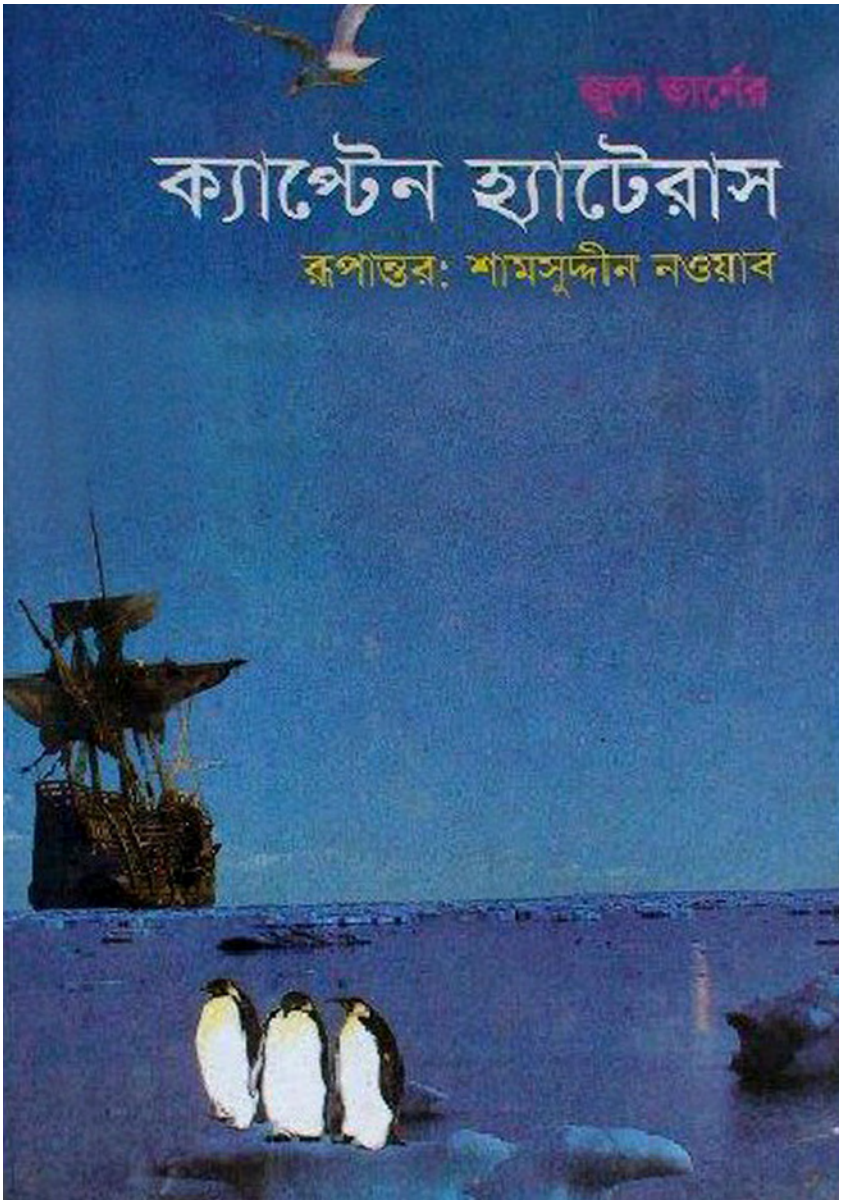

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৪

এক

লিভারপুল। ৫ এপ্রিল। ১৮৬০ সাল।

'লিভারপুল হেরাল্ডের' ছোট্ট এক খবর সবার মনোযোগ কেড়ে নিল। পরদিন অর্থাৎ ৬ এপ্রিল ফরওয়ার্ড জাহাজ নিউ প্রিন্স ডক থেকে অজ্ঞাত যাত্রায় নোঙর তুলছে।

প্রতিদিন এমন কত জাহাজ আসে যায় কে তার খোঁজ রাখে? যে যার কাজে ব্যস্ত। কোন্ জাহাজ ছাড়ল আর কোন্ জাহাজ বন্দরে ঢুকল তা নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না। অথচ ৬ এপ্রিল নিউ প্রিন্স ডক লোকে লোকারণ্য। চার মাইল লম্বা ডকে সারি সারি জাহাজ। ওগুলোর দিকে খেয়াল নেই, লোকে এসে ভিড় করেছে ফরওয়ার্ড জাহাজের সামনে। লোকজন আসছে তো আসছেই। দূর-দূরান্ত থেকে বাসে, ট্রাকে, সাইকেলে এমনকি হেঁটেও এসেছে লোকে, আসছে এখনও। কি যেন এক রহস্য ঘিরে আছে জাহাজটিকে।

ফরওয়ার্ডে তোলা হয়েছে পাঁচ-ছয় বছর চলার মত প্রয়োজনীয় খাবার দাবার, কয়লা, সীলের চামড়া দিয়ে তৈরি পোশাক, ওষুধপথ্য ইত্যাদি যা যা প্রয়োজন সব। জাহাজটি এঞ্জিনেও চলে আবার পালে চলারও ব্যবস্থা আছে। বিশাল পাল। তাই দেখে পাশের জাহাজের নাবিকেরা ধারণা করে নিল এটা সম্ভবত উত্তর মেরুর দিকে রওনা হবে। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার ফরওয়ার্ড জাহাজের নাবিকেরাই জানে না তারা কোথায় যাচ্ছে। পাঁচ গুণ মাইনে অগ্রিম পেয়ে কেউই টুঁ শব্দটিও করছে না! সবাই ক্যাপ্টেনের আদেশে নোঙর তোলার অপেক্ষা করছে।

কিন্তু আশ্চর্য, ফরওয়ার্ডের ক্যাপ্টেনের কোন পাত্তাই নেই! জাহাজের মেট হিসেবে কাজ করছে রিচার্ড শ্যানডন। ক্যাপ্টেন হবার সব যোগ্যতা আর বিচক্ষণতা তার আছে। অত্যন্ত আকর্ষণীয় বেতনের লোভে শ্যানডন এসেছে মেট হিসেবে।

প্রচুর টাকা ব্যয় করে মজবুতভাবে ফরওয়ার্ডকে তৈরি করিয়েছে শ্যানডন। নিউ ক্যাসল-এর কারখানা থেকে বিশেষভাবে তৈরি হয়েছে ১২০ অশ্ব শক্তির এঞ্জিন। ডেকে বসানো হয়েছে ষোলো পাউন্ড গোলা নিক্ষেপের কামান। এছাড়াও জাহাজে তোলা হয়েছে হাজার হাজার রকেট, সিগন্যাল বাতি, বিরাট বিরাট করাত, প্রচুর বারুদ, অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি এবং আরও কত কি! এ যেন এক রণযাত্রা। এ সমস্ত আলামত দেখেই ফরওয়ার্ডকে নিয়ে লোকজনের জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। সবচাইতে আলোচনা জাহাজের একটি কুকুরকে নিয়ে। সবাই বলছে ক্যাপ্টেন নাকি আসলে ওই কুকুরটিই, এ জন্যেই ফরওয়ার্ডের সমুদ্র যাত্রার কথা শুনে এত হাজার হাজার লোক ছুটে এসেছে ডকে।

কিন্তু কথা হল, জাহাজটা যাচ্ছে কোথায়?

রহস্যের সূত্রপাত আটমাস আগে। হঠাৎ একদিন অদ্ভুত একটা চিঠি পেল রিচার্ড শ্যানডন। চিঠিটা এরকম:

রিচার্ড শ্যানডন, **অ্যাবারডিন**
লিভারপুল। ২ আগস্ট, ১৮৫৯।

ফ্রেন্ড,

আপনার জন্যে মাকুয়ার্ট কোম্পানির ব্যাংকে ষোলো হাজার পাউন্ড জমা দেয়া হয়েছে। এ চিঠির সঙ্গে আমার সই করা অনেকগুলো চেকের পাতা পাঠাচ্ছি। আপনার প্রয়োজন মত যে-কোন সময়ে যে-কোন অঙ্কের টাকা তুলতে দ্বিধা করবেন না। আমি আপনার অপরিচিত হলেও আপনি আমার পরিচিত। আপনার অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য সবকিছু সম্পর্কেই আমি অবগত আছি। আর সেজন্যেই আপনাকে ফরওয়ার্ড জাহাজের চীফ অফিসার হবার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনার সম্মতি থাকলে বেতন হিসেবে পাবেন পাঁচশো পাউন্ড। প্রতি বছর পঞ্চাশ পাউন্ড করে বাড়বে আপনার মাইনে।

তবে একটি কথা। ফরওয়ার্ড জাহাজ এখনও তৈরিই হয়নি। চিঠির সঙ্গে দেয়া প্ল্যান অনুযায়ী জাহাজ আপনাকেই বানিয়ে নিতে হবে। আমাদের অভিযানটা হবে বিপদসঙ্কুল এবং অনেক বছরের। সুতরাং সবদিক বিবেচনা করে বেছে বেছে পনেরো জন কর্মচারী নিয়োগ করবেন। আপনি এবং আমি মিলে হব ১৭ জন। আর একজন আসবেন আমাদের সহযাত্রী ডক্টর ক্লবোনি। তিনি সময় মত জাহাজে পৌঁছে যাবেন। সব মিলিয়ে আমরা হব ১৮ জন অভিযাত্রী।

নাবিকদের সবাইকে অবশ্যই অবিবাহিত এবং ইংরেজ হতে হবে। মদ টদ খাওয়া একেবারেই চলবে না। শক্ত-সমর্থ ভাল স্বাস্থ্য হতে হবে সবারই। নাবিকদের প্রচলিত মাইনের চেয়ে অনেক বেশি টাকা দেবার প্রস্তাব রাখবেন। বছরে বছরে ওদের মাইনে বাড়বে শতকরা দশ ভাগ। অভিযান শেষে সবাই পাঁচশো পাউন্ড করে বোনাস পাবে আর আপনি পাবেন দুহাজার পাউণ্ড।

আমার প্রস্তাবে সম্মত হলে–কে. জেড., পোস্ট–রেস্তানডে, গ্যেটবার্গ, সুইডেন এই ঠিকানায় আপনার সম্মতি-পত্র দেরি না করে পাঠিয়ে দিন।

আপনি এই অভিযান পরিচালনার প্রাথমিক গুরু দায়িত্ব পালনে রাজি থাকলে, ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি বিরাটাকার ডেনিশ কুকুর ফরওয়ার্ডে উঠবে। কুকুরটির খাওয়া-থাকা, পরিচর্যা তদারকের কাজটিও আপনাকে করতে হবে। কুকুরটির প্রাপ্তি ইটালির পোস্টমাস্টারের ঠিকানায় জানাতে হবে। আর যে কথাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ–প্রয়োজন দেখা দিলেই কেবল আমাকে আপনার পাশে পাবেন। জাহাজ চলবে আপনার নির্দেশে এবং আপনি চালাবেন আমার লিখিত নির্দেশে।

শুভ কামনায়,
(স্বাক্ষর) কে. ফরওয়ার্ডের ক্যাপ্টেন।

অত্যন্ত অভিজ্ঞ নাবিক এই রিচার্ড শ্যানডন। তার বৈচিত্র্যময় নির্ঝঞ্ঝাট জীবনে অসংখ্যবার নানান অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে সে। বিয়ে করেনি বলে সংসারেও কোন ঝামেলা নেই। সেজন্যেই কে. জেডের চিঠি পেয়ে সে মোটেও অবাক হল না। হল না উত্তেজিত। বরং খুশিই হল অজানার পথে পা বাড়াবার হাতছানি পেয়ে।

চিঠিটা কোন দুষ্ট লোক খামোকা হয়রানি করবার জন্যে লিখল অথবা কোন বন্ধু-বান্ধবের কারসাজি কিনা পরখ করে দেখার জন্যে আর সময় নষ্ট না করে শ্যানডন সোজা গিয়ে হাজির হল মাকুয়ার্ট ব্যাংকে। অভিজ্ঞ মন যদিও বলছিল এ প্রস্তাব সত্যি, মিথ্যা নয়। ব্যাংকে গিয়ে দেখল সত্যি সত্যিই তার নামে ১৬ হাজার পাউন্ড জমা রয়েছে। তাহলে আর দেরি কিসের? তক্ষুণি ব্যাংকে বসেই চিঠি লিখে কে. জেডকে জানিয়ে দিল তার সম্মতির কথা।

কাজের লোক শ্যানডন। একটি মুহূর্তও নষ্ট করতে চায় না সে। সোজা চলে গেল পরিচিত এক জাহাজ নির্মাণের কারখানায়। পরের দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল ফরওয়ার্ড জাহাজ তৈরির কাজ।

শ্যানডনের বয়স চল্লিশ হলেও কাজের উদ্যম দেখে কিছুতেই মনে হবে না তার বয়স কুড়ি-পঁচিশের বেশি। যেমন নিজে খাটে তেমনি অন্যকেও খাটাতে জানে। তার তদারকিতে পুরোদমে কাজ এগিয়ে চলল।

জাহাজ নির্মাণ শুরু হল। এবার লোক বাছাইয়ের পালা। প্রথমেই সেকেন্ড মেট হিসেবে শ্যানডন নিয়ে এল জেমস ওয়ালকে। জেমসের বয়স মাত্র তিরিশ। কিন্তু বহুবার উত্তরের অভিযানে গিয়ে সে এখন একজন ঝানু নাবিক। কাজ ছাড়া কিছুই বোঝে না। ভ্রমণের নেশাও রক্তে মিশে আছে। তাই এক কথায় রাজি হয়ে গেল সে। জিজ্ঞেসও করল না কোথায় যেতে হবে।

ডেক অফিসার হিসেবে বাছাই করা হল জনসনকে। তারপর তিনজন মিলে খুঁজে বের করল অন্যান্যদের। কয়েকগুণ বেশি মাইনের লোভ আছে ঠিকই, কিন্তু কোথায় যেতে হবে জানতে না পারায় রাজি হতে চায় না নাবিকরা। তবুও শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন মত শক্ত সমর্থ নাবিক খুঁজে পাওয়া গেল। একটা ব্যাপারে শ্যানডন বেশি লক্ষ্য রেখেছিল। নাবিকেরা সবাই যেন প্রোটেস্ট্যান্ট অর্থাৎ একই ধর্মমতের হয়। কারণ সমুদ্র যাত্রায় বিপদের সময় সমবেত প্রার্থনা অনেক সাহসের সঞ্চার করে এবং বিপদ এড়াতেও সাহায্য করে। সে কারণে এসব ক্ষেত্রে সবাই এক ধর্মমতের হওয়া ভাল। লোকজন বাছাই শেষ হতেই রিচার্ড শ্যানডন কেনাকাটা শুরু করে দিল। রাজ্যের জিনিসপত্র কিনতে হবে। খাবার-দাবার, জামা-কাপড়, যন্ত্রপাতি, গোলা-বারুদ এবং আরও অনেক কিছু। এরই ফাঁকে ফাঁকে জাহাজ কারখানায় গিয়ে জাহাজ নির্মাণের তদারকি করে আসে। উল্টানো তিমি মাছের মত পাঁজরা বার করা আকৃতিতে তৈরি হচ্ছে জাহাজটা।

২৩ জানুয়ারির সকাল। অন্যান্য দিনের মত ফেরিতে চড়ে জাহাজ কারখানার দিকে যাচ্ছে শ্যানডন। সাংঘাতিক কুয়াশায় কিছু দেখা যায় না। কম্পাসের উপর নির্ভর করে নৌকা চালাতে হচ্ছে। মাত্র দশ মিনিটের পথ হলেও প্রচুর সময় নিচ্ছে। খুব ধীর গতিতে এগোচ্ছে ফেরি। হঠাৎ শ্যানডন লক্ষ করল এই ঘন কুয়াশার

মাঝেও এক ভদ্রলোক তার দিকে এগিয়ে আসছে। ভদ্রলোক যদিও একটু বেঁটে এবং মোটা তবুও বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, রসিক চোখ এবং আচরণের মাধুর্য দেখলেই পরিচিত হতে ইচ্ছে করে।

ভদ্রলোক কোন ভূমিকা না করেই সোজা এসে শ্যানডনের হাত নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিলেন। একনাগাড়ে দ্রুত কথা বলছেন ভদ্রলোক। অনর্গল কি যে বলে গেলেন প্রথমে কিছুই বুঝল না শ্যানডন। নীরবে পর্যবেক্ষণ করে চলল ভদ্রলোককে। ধীমান ব্যক্তিদের মত ছোট ছোট চোখ। চেহারাই বলে দেয় দৃঢ় আত্মশক্তি তাঁর। কিন্তু কে হতে পারেন এই ভদ্রলোক? হঠাৎ একটা নাম মনে এল শ্যানডনের। ঝড়ের বেগে কথা বলার ফাঁকে যেইমাত্র শ্বাস নেবার জন্যে থেমেছেন ভদ্রলোক, অমনি সুযোগ পেয়ে শ্যানডন প্রশ্ন করল, 'আপনি কি ডক্টর ক্লবোনি?'

'অবশ্যই!' বলে আবার কথার তুবড়ি ছোটালেন ডক্টর ক্লবোনি, 'আমি তো ভেবেছিলাম কমান্ডার, রিচার্ড শ্যানডন বলে আদৌ কেউ নেই। সবই মিছে হয়রানি। পনেরো মিনিট ধরে আপনাকেই খুঁজছি, কমান্ডার। আর পাঁচ মিনিট খোঁজার পর ধরে নিতাম আমার পরিশ্রমই বৃথা হল। যাক, আপনাকে দেখে কি যে আনন্দ হচ্ছে তা বলে বোঝাতে পারব না।'

'একটা কথা, ডক্টর,' শ্যানডন কিছু বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু কে কার কথা শোনে।

ক্লবোনি বলেই চলেছেন, 'আমাদের যাত্রা তাহলে শুরু হচ্ছে?'

'তবে, ডক্টর–'

'কোন কথা নয়! মাঝপথ থেকে ফিরে আসা চলবে না। যেতে আমাদের হবেই।'

'ডক্টর–'

'আপনাকে দেখে আমি আশ্বস্ত হয়েছি। সাহসী নাবিক আপনি।'

'আমার একটা প্রশ্ন–'

'এ ধরনের অভিযানে আপনি যোগ্য ব্যক্তি। ক্যাপ্টেন নিঃসন্দেহে উপযুক্ত লোক খুঁজে পেয়েছেন।'

'ক্যাপ্টেন হয়ত ঠিকই করেছেন। কিন্তু আমার একটি প্রশ্ন ছিল!'

'একটি কেন? একশোটা প্রশ্ন করুন না!'

'আপনি কিভাবে জড়ালেন এই অভিযানে?'

'ওহ্, এই কথা!' একটি কাগজ পকেট থেকে বের করে এগিয়ে দিলেন ডক্টর ক্লবোনি। অতি সংক্ষিপ্ত চিঠি:

ডক্টর ক্লবোনি, ইনভারনেস,
লিভারপুল। ২২জানুয়ারি, ১৮৬০।

ফ্রেন্ড,

ফরওয়ার্ড জাহাজে করে যদি অজানা পথে সমুদ্র যাত্রায় আগ্রহী হন, তাহলে কমান্ডার রিচার্ড শ্যানডনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

(স্বাক্ষর) কে. জেড.
ফরওয়ার্ডের ক্যাপ্টেন।

ক্লবোনি জানালেন মাত্র কিছুক্ষণ আগে তিনি পেয়েছেন চিঠিটা। কিন্তু কোথায় যেতে হবে তা জানেন না।

ক্লবোনি বলে চলেছেন, 'কোথায় যেতে হবে জেনেই বা কি লাভ? জানার আগ্রহ আছে দেখার ইচ্ছে আছে তাই বেরিয়ে পড়তে চাই। লোকে ভাবে আমি কত বড় জ্ঞানী। কত কিছু জানি! আসলে কিছুই জানা হয়নি, শেখা হয়নি, দেখা হয়নি। আর তাই যখনই সুযোগ পাই বেরিয়ে পড়ি সমুদ্রে। ঝালিয়ে নেই ইতিহাস, ভূগোল, ভূতত্ত্ব, রসায়ন, খনিজ, উদ্ভিদ, পদার্থ, যন্ত্র, ডাক্তারী, সার্জারি ইত্যাদি বিদ্যা।'

শ্যানডন বুঝে ফেলেছে এই লোক একটি আস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। তাই জানতে চাইল, 'কিন্তু ডক্টর, আমরা কোন্‌দিকে, কোথায় যাচ্ছি?'

'যেদিকে গেলে দেখা হবে অনেক নতুন দেশ, বিভিন্ন জাতির মানুষ, তাদের বিস্ময়কর রীতিনীতি, আচার আচরণ। আর তাই যেতে হবে উত্তর দিকে।'

কথা বলতে বলতে ফেরি নৌকা এসে থামল জাহাজ কারখানার কাছে। নেমে পড়ল দুজনে। ফরওয়ার্ড জাহাজের পাঁজরা বার করা গড়ন দেখে দারুণ খুশি হলেন ক্লবোনি। এ জাহাজের ডাক্তার হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তাঁকে।

মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই ডাক্তার হয়েছিলেন ক্লবোনি। চল্লিশ পার হতে না হতেই নানা বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করলেন। রহস্যময় ফরওয়ার্ড জাহাজে চাকরি নিয়ে অজ্ঞাত যাত্রায় রওনা হচ্ছেন শুনে বন্ধু-বান্ধবেরা অনেকে বাধা দিয়েছিল। তাতে ক্লবোনির জেদ আরও চেপে যায়। পারেন তো এক্ষুণি জাহাজ জলে ভাসান।

৫ ফেব্রুয়ারি জাহাজ নামানো হল পানিতে। ১৫ ফেব্রুয়ারি এডিনবারা থেকে সেই বিরাটাকার ডেনিশ কুকুর জাহাজে এসে পৌঁছুল। অদ্ভুত এই কুকুরটির আচরণ। চোখ দুটো দেখলেই শরীর কেমন যেন করে ওঠে! জাহাজের নাবিকেরা কিন্তু প্রথম দর্শনেই কুকুরটিকে অপছন্দ করে বসল।

দুই

সমুদ্রে যাত্রার সব আয়োজনই প্রায় শেষ। ৬ এপ্রিল রওনা হবার দিন ঠিক করা হয়েছে। কারা যাচ্ছে তার একটা লিস্ট তৈরি করেছে শ্যানডন। অদৃশ্য ক্যাপ্টেন সহ মোট আঠারো জনের নাম রয়েছে লিস্টে। তারা: কে. জেড-ক্যাপ্টেন, রিচার্ড শানডন-ফার্স্ট মেট, জেমস ওয়াল-সেকেন্ড মেট, ডক্টর ক্লবোনি-ডাক্তার, জনসন-ডেক নাবিকদের অফিসার, সিম্পসন-হার্পুনার, বেল-ছুতোর, ব্রানটন-চীফ এঞ্জিনিয়ার, প্লোভার-সেকেণ্ড এঞ্জিনীয়ার, স্ট্রং-বাবুর্চি, ফোকার-বরফ সর্দার, ওয়ালটন-কামার, ওয়ারেন-কয়লা জোগানদার এবং বোল্টন, গ্যারী, ক্লিফটন, গ্রিপার, পেন-নাবিক।

সবাই যার যার কেবিন গুছিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। শ্যানডনও চায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা হতে। তা নাহলে দেরি দেখে নাবিকেরা হয়ত বেঁকে বসতে পারে। বিশেষ করে কুকুরটির চাল-চলন সবাইকে কেমন যেন ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

ক্যাপ্টেনের কেবিনে তালা মেরে চাবি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ইতালির পোস্টমাস্টারের ঠিকানায়। ঠিক ক্যাপ্টেনের কেবিনের সামনেই কুকুরটির ঘর। তবে কুকুরটি ঘরে থাকার চাইতে বাইরে টহল দেয়াই বেশি পছন্দ করে। কারও কথা শোনে না, কাউকে মানে না। আর রাত-দুপুরে এমন বিকট সুরে কেঁদে ওঠে যে রীতিমত ভয় পেয়ে যেতে হয়।

কুকুরটা এমনভাবে ডেকের উপর টহল দেয়, দেখে মনে হয় যেন স্বয়ং ক্যাপ্টেন, গভীর চিন্তামগ্ন, হেঁটে বেড়াচ্ছেন জাহাজের ডেকে। ডক্টর ক্লবোনি বনের বাঘকে পোষ মানাতে পারলেও কুকুরটির বেলায় একদম নিরাশ হলেন। এমন বেয়াড়া কুকুর এর আগে তিনি দেখেননি। নাবিকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করে দিল, এই কুকুরটি শয়তানের চেলা না হয়েই যায় না। সময় মত কুকুরের রূপ ছেড়ে আসল চেহারায় আত্মপ্রকাশ করবে; জাহাজের সবাইকে নির্দেশ দেবে।

কুকুরটি সম্পর্কে নাবিকদের এই ধারণা আরও পাকাপোক্ত হল সেদিন, যখন পেন কুকুরটিকে জখম করতে গিয়ে নিজের মাথা ফাটিয়ে বসল। এ থেকে কুকুর-ভীতি জাহাজের সবার মনে আরও জেঁকে বসল। সবাই ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করছে কবে কুকুরটি নিজের খোলস বদলে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে।

জাহাজের কুকুর-ভীতি ডক্টর ক্লবোনিকে মোটেও দুশ্চিন্তায় ফেলেছে বলে মনে হয় না। একমনে তাঁর কেবিন সাজিয়ে চলেছেন তিনি। ওষুধপত্র থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সবকিছু এমন ভাবে সাজিয়ে নিয়েছেন, যেন হাত বাড়ালেই ঠিক জিনিসটি পাওয়া যায়।

পাঁচ তারিখ সন্ধ্যায় খেতে বসে কথা হচ্ছিল, কি করা যায় এখন। মহা সমস্যায় পড়েছে শ্যানডন। জাহাজ ছাড়বার কথা আগামীকাল অথচ এখনও ক্যাপ্টেনের নির্দেশের কোন নিশানাই নেই। ক্যাপ্টেনের আদেশ ছাড়া নোঙর তোলা সম্ভব নয়। নাবিকেরা এমনিতেই ভাগে ভাগে অবস্থা। তাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাই নানা রকম ভয় দেখাচ্ছে। জাহাজ কোথায় যাবে তার কোন ঠিক নেই। জাহাজের ক্যাপ্টেনেরও কোন পাত্তা নেই। শ্যানডন ঠিক করে ফেলেছে, ক্যাপ্টেনের নির্দেশ আসুক আর না আসুক আগামীকাল রওনা হয়ে পড়বে।

পরদিন সকাল থেকেই কৌতূহলীদের ভিড় বাড়ছে তো বাড়ছেই। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। দেখতে দেখতে বারোটা বেজে গেল। বারোটার ডাকেও কোন চিঠি পেল না শ্যানডন। আর অপেক্ষা করা যায় না। বেলা একটা থেকে ভাটা শুরু হবে। জোয়ার থাকতে থাকতেই রওনা হতে না পারলে জাহাজ সমুদ্রে বের হতে পারবে না। আর দেরি না করে জাহাজ ছাড়ার নির্দেশ দিল শ্যানডন। দর্শকদের ডেক থেকে নামিয়ে দিয়ে নাবিকেরা যেই নোঙর তোলার ব্যবস্থা করছে অমনি শোনা গেল কুকুরের ডাক। সবাই অবাক চোখে দেখল দর্শকদের মাঝ দিয়ে পথ করে ছুটে আসছে সেই ডেনিশ কুকুরটি। দাঁতের ফাঁকে একটি চিঠি। শ্যানডন বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'চিঠি, চিঠি! উনি তাহলে কাছেই কোথাও আছেন!'

জনসন মৃদু স্বরে উত্তর দিল, 'তা তো বটেই, তা না হলে কুকুরটা চিঠি পেল কোথায়!'

ডক্টর ক্লবোনি কুকুরটিকে তার কাছে ডাকলেন। বেয়াড়া কুকুর ডক্টরকে গ্রাহ্যই করল না। সোজা শ্যানডনের পায়ের কাছে চিঠিটা ছেড়ে দিয়ে বিকট আওয়াজ করে ডেকে উঠল তিনবার। যেন শ্যানডনকে চিঠিটা পড়ার নির্দেশ দিচ্ছে।

'চিঠিতে কি লেখা আছে দেখুন না!' ডক্টর ক্লবোনির কথায় হতভম্ব শ্যানডন বাস্তবে ফিরে এল।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখল শ্যানডন, খামের ওপর তার নাম ছাড়া আর কিছুই লেখা নেই। কোন তারিখ কিংবা ডাকঘরের ছাপ কিছুই নেই। ছোট্ট একটি নির্দেশ: ফেয়ারওয়েল অন্তরীপ অভিমুখে যাত্রা শুরু করুন। এপ্রিলের বিশ তারিখ নাগাদ পৌঁছে যাবেন। সেখানে পৌঁছেও যদি ক্যাপ্টেনের দেখা না পান তাহলে ডেভিস প্রণালী পার হয়ে বাফিন উপসাগর হয়ে যেতে হবে মেলভিল উপসাগরে।

(স্বাক্ষর) কে. জেড়.

তিন

জাহাজ সমুদ্রে ভাসতেই সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে এল। নাবিকদের উত্তেজনা, ভয়, ভীতি সব উবে গিয়ে সমুদ্র যাত্রার আনন্দ ফুটে উঠল সবার চোখে-মুখে। সমুদ্র যাত্রার মজাই এটা। যাত্রার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যত ভীতি আর উত্তেজনা। যাত্রা শুরু হলেই সব ঠিক। সবাইকে তখন ভ্রমণের নেশায় পেয়ে বসে।

পাল তুলে তরতরিয়ে ছুটে চলেছে জাহাজ। ইতিমধ্যেই পার হয়ে গেছে বেশ ক'টি দিন। মাঝে মাঝেই নানান সামুদ্রিক পাখি সঙ্গ নেয় জাহাজের। একদিন ডেকের উপর উড়ে এল একটি পাফিন আর একটি পেট্রল পাখি। ডক্টর গুলি করে পাফিনটা মারলেন। হার্পুনার সিম্পসন ডেক থেকে কুড়িয়ে আনল পায়রার চাইতে একটু বড় আকৃতির পাখিটা। ডক্টরকে জিজ্ঞেস করল, 'এ পাখি তো খাবার যোগ্য নয়, একেবারেই অখাদ্য। তবু কেন খামোকা মারলেন এটাকে?'

'সামুদ্রিক পাখির মাংসে বোটকা গন্ধ হয়, খেতে খারাপ ঠিকই। কিন্তু আমি এমনভাবে রাঁধব যে তোমার জিভেও পানি এসে যাবে।'

'আপনি রাঁধতেও জানেন, ডক্টর?'

'পণ্ডিত হতে হলে অনেক কিছুই জানতে হয়।' মৃদু হাসলেন ডক্টর ক্লবোনি।

সত্যিই, চমৎকার রান্না করতে পারেন ক্লবোনি। পাখিটার সমস্ত চর্বি কৌশলে চেঁছে ফেলে দিলেন। আসলে সামুদ্রিক পাখির চর্বিতেই আঁশটে গন্ধটা থাকে। চর্বি ফেলে মসলাপাতি দিয়ে ঠিকমত রাঁধতে পারলে চমৎকার সুস্বাদু ও মুখরোচক হয়।

গালফ স্ট্রীমে ফরওয়ার্ড পৌঁছুল ১৪ এপ্রিল। আরও দুশো মাইল গেলে গ্রীনল্যান্ড। শীতের প্রকোপ এখনও শুরু হয়নি। তবে কিছুটা ঠাণ্ডা ভাব রয়েছে। চমৎকার আবহাওয়া। ডক্টর তো পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে মহা আনন্দে ডেকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এভাবে ভালই কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন দূরে দেখা

গেল ভাসমান বরফের একটা চাঁই।

শ্যানডন ভীষণ অবাক হল। উত্তর মেরু সেই কোথায়, আর এখানে হিমশিলা!

শ্যানডনকে বোঝালেন ডক্টর। ইতিহাসখ্যাত কয়েকটি সমুদ্র যাত্রার গল্প বললেন। গড়গড় করে বলে গেলেন কোন্ সালের কত তারিখে কখন কোথায় ভাসমান হিমশিলা দেখা গেছে সুমেরু থেকে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ ডিগ্রি দূরে। তাই অবাক হবার কোন কারণই নেই।

ডক্টর যেন একটি জীবন্ত বিশ্বকোষ। কোন কিছুই তার অজানা নয়। তবুও তিনি একটি রহস্যের সমাধান আজও করতে পারেননি। সমুদ্রের এই রহস্য তিমি শিকারিরাও লক্ষ করে, কিন্তু ব্যাখ্যা জানে না। বাতাস যখন শান্ত থাকে তখন সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ ওঠে আর বৃষ্টি নামলেই সমুদ্র একদম শান্ত হয়ে যায়। এই রহস্যটা আজও রহস্যই রয়ে গেছে।

ক্যাপ্টেনের নির্দেশ অনুসারে ফেয়ারওয়েল অন্তরীপ পৌছতে হলে শুধু পালের ভরসায় থাকলে চলবে না। শ্যানডন এঞ্জিন চালাবার আদেশ দিল। এঞ্জিন চালু হতেই দ্রুত গতিতে ছুটে চলল জাহাজ। ঝড়ো বাতাস ঠেলে অনেক কষ্টে ফেয়ারওয়েল অন্তরীপে এসে পৌছল। দূরবীন চোখে লাগালে গ্রীনল্যান্ডের আবছা আকৃতি দেখা যায় এখন।

ক্লবোনি ভাবছেন স্যার জন ফ্রাঙ্কলিনের কথা। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রাঙ্কলিন এই অঞ্চলেই ডিস্কো দ্বীপ পার হয়ে দুটি জাহাজ সহ হঠাৎ করে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। কোন পাত্তাই আর মেলেনি তাঁর।

পরদিন সকালে কেপ ডেজোলেসনে এসে পড়ল জাহাজ। জনসন আক্ষেপ করে ডক্টরকে বলল, 'মাত্র কয়েক সপ্তাহ ছাড়া সারাটা বছরই এই এলাকা বরফে ঢাকা থাকে। জায়গাটার নাম গ্রীনল্যান্ড রাখা ঠিক হয়নি।'

ডক্টর ক্লবোনি আবারও তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে বসলেন, 'দশম শতাব্দীতে গ্রীনল্যান্ডের অবস্থা এরকম ছিল না। নবম শতাব্দীতেও এখানে সবুজে ছাওয়া সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল...' একটানা অনেক কথা বলে গেলেন ক্লবোনি। জনসন মনোযোগ দিয়ে শুনল ডক্টরের কথা।

ফরওয়ার্ড যতই এগিয়ে চলেছে দুর্ভোগও ততই বেড়ে চলেছে। চারদিক থেকে বরফ এমনভাবে ভেসে আসছে যে জাহাজ চালানই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। লগি দিয়ে বরফ ঠেলে নৌকার মত চলতে হচ্ছে। একটু অসাবধান হলেই ভাসমান হিমশিলার সঙ্গে ধাক্কা লেগে মারাত্মক কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ক'দিন একটানা বরফের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল নাবিকেরা।

পথ আর শেষ হয় না। ২৭ এপ্রিল মেরুবৃত্ত পেরিয়ে এল ওরা। দূরের ভাসমান বরফের পাহাড় দেখে মনে হচ্ছে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে, কিন্তু আসলে তা কম করে হলেও দশ-বারো মাইল দূরে! এ এক মরীচিকার খেলা। এমন কি ডক্টর ক্লবোনিও হার মানলেন আলোর এই ভেলকিবাজির কাছে।

যতই দিন যাচ্ছে ততই প্রকৃতি যেন বিরূপ হয়ে উঠছে। আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে সমুদ্রের রূপ। চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। বরফের উপর

সূর্যের উজ্জ্বল আলো চারদিকে এমন এক চোখ ধাঁধানো পরিবেশের সৃষ্টি করল যে খালি চোখে চেয়ে থাকাই দায়। সবুজ কাঁচের চশমা পরে নিলেন ডক্টর, অন্যদেরও পরতে উপদেশ দিলেন, আর বললেন–চশমা ছাড়া কেউ যেন রোদের দিকে না তাকায়। এতে ছোঁয়াচে চোখের রোগ দেখা দিতে পারে।

বিপদ যতই এগিয়ে আসছে জাহাজে উদ্ভট জল্পনা-কল্পনা ততই বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে ক্যাপ্টেন এবং কুকুরটিই হয়েছে মূল আলোচ্য বিষয়। এখনও ক্যাপ্টেনের কোন পাত্তা নেই, কিন্তু জাহাজ ঠিকই এগিয়ে চলেছে অজানা গন্তব্যস্থলের দিকে। কে জানে কোন্ বিপদের মাঝে! ক্যাপ্টেন নেই এ কথা অনেকেই মানতে চায় না। ওদের ধারণা ক্যাপ্টেন নিশ্চয়ই জাহাজে আছেন। হঠাৎ একদিন বদ্ধ ঘর খুলে বেরিয়ে আসবেন। এ কথাকে মোটেও আমল না দিয়ে একজন বলে উঠল, 'এ জাহাজের ক্যাপ্টেন তো ওই কুকুরটি। কেমন তার চলাফেরা! ঠিক যেন জাহাজের মালিক। টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখছে। পাল ঠিকমত টানা হল কিনা তাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বেড়ায় কুকুরটা। সেদিন তো একদম ক্যাপ্টেনের মত হালের চাকা ধরে দাঁড়িয়েছিল।' এ কথা শুনে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নাবিকদের নাভিশ্বাস ওঠে আর কি! কুকুরটিকে আজ পর্যন্ত কেউ খেতে দেখেনি। খাবার যেমনটি দেয়া হয় তেমনটি পড়ে থাকে! তাহলে কি খায়, কোথায় খায় কুকুরটি? মাঝে মাঝেই বরফ পাহাড়ে গিয়ে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে আসে সে। কি করে সেখানে? এবার কুকুর-ভীতি বেশ ভালভাবেই পেয়ে বসল নাবিকদের।

বিপদ আসছে, বিপদ! ভাসমান বরফের পাহাড় চারদিক থেকে ঘিরে ধরছে জাহাজকে, যেন পিষে মারবে। নাবিকেরা বরফ কাটার করাত নিয়ে তৈরি হয়ে রইল। এইসব বরফের চাঁই যে চাপ সৃষ্টি করতে পারে তা প্রায় এক কোটি টনের কাছাকাছি। ভয় পেলেও নাবিকেরা সাহসের সঙ্গে লড়াই করে মরতে চায়। কাপুরুষের মত হাল ছেড়ে দিতে তারা নারাজ। নাবিকদের উদ্যমের প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেও জাহাজকে এগিয়ে নেয়া গেল না। বরফের গায়ে লোহার গলুই দিয়ে ঠেলা মেরেও পথ করে নেয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত রাতে নোঙর ফেলতে বাধ্য হল ওরা।

তাপমাত্রা ক্রমেই নেমে আসছে। পরদিন তাপমাত্রা নেমে এল শূন্যের আট ডিগ্রি নিচে। এই আবহাওয়াতেও উত্তরের দিকে কয়েক মাইল এগিয়ে গেল ফরওয়ার্ড। মাঝরাতের দিকে ডাঙা থেকে তিরিশ মাইল দূরে এসে পৌঁছুল।

বিপদ বেড়েই চলেছে। এতক্ষণ ভালই ছিল। এখন বরফের বিশাল চাক ভেঙে ভেঙে ভেসে যাচ্ছে। যে-কোন মুহূর্তে সাংঘাতিক সংঘর্ষ ঘটে যেতে পারে। এই বিপদে হালের চাকা হাতে নিল গ্যারী। জাহাজ চালাতে সবচেয়ে ঝানু এই গ্যারী। এঁকেবেঁকে আশ্চর্যভাবে গা বাঁচিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সে। ফরওয়ার্ডের নাবিকেরা দুভাগে জাহাজের সামনে ও পিছনে দাঁড়িয়ে লম্বা লগি দিয়ে ভাসমান হিমশিলা ঠেলে জাহাজের পথ করে নিচ্ছে।

বিপদের যেন আর শেষ নেই। একটা বিপদ কাটছে তো আর একটা এসে

হাজির হচ্ছে। এ যাত্রা বুঝি আর পার পাওয়া গেল না। সাক্ষাৎ যমদূতের মত এগিয়ে আসছে এক বিরাট বরফ পাহাড়। ঘুরতে ঘুরতে আসছে আর আশপাশ থেকে ভেঙে ভেঙে কামানের গোলার মত আওয়াজ হচ্ছে। ডানে-বাঁয়ে কোনদিকেই যাবার পথ নেই। একশো ফুট উঁচু পাহাড় সোজা এগিয়ে আসছে। মৃত্যু এবার অবধারিত। নাবিকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে লগি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়ল ডেকের উপর।

এই এল বলে-!

ওই টালমাটাল অবস্থায় কে যেন অচেনা গলায় ধমক দিয়ে সবাইকে চুপ থাকতে বলল।

শুধু গ্যারী একা অসম সাহসে হাল ধরে রইল। হঠাৎ জাহাজের ওপর একটা বিরাট ঢেউ ভেঙে পড়ল। বিকট এক ঝাপটা খেয়ে জাহাজ এগিয়ে চলেছে। সামনে সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় সমুদ্রের ঢেউ খেলা করছে। অদৃশ্য হয়ে গেছে সেই মৃত্যুদূত হিমশিলা।

অবাক চোখে জনসন প্রশ্ন করল, 'ডক্টর, আমরা কি বেঁচে গেলাম? কিভাবে বাঁচলাম আমরা?'

'স্রেফ কপালের জোরে! হিমশিলার গা থেকে সমানে বরফ ভেঙে পড়ছিল বলে সেটা সামনের দিকে ঠিকমত এগোতে পারছিল না। তার ওপর আবার চারদিককার চাপ। সবকিছু মিলিয়ে বেচারা পড়েছিল একটু বেকায়দায়; আর সেজন্যেই তো জাহাজের ওপর পড়বি পড়বি করেও শেষমেষ কাত হয়ে আছড়ে পড়ল সমুদ্রে। তবে হ্যাঁ, আর মিনিট দুয়েক দেরি হলেই রক্ষে ছিল না—একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে যেত জাহাজটা।'

চার

নানান ঝড় ঝাপটার মধ্যে দিয়ে মেরুবৃত্ত পার হবার পর একটা বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল শ্যানডন এবং জাহাজের অন্য সবার জন্যে। ৩০ এপ্রিল ভোরে শ্যানডন তার ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল। টেবিলের ওপর একটা চিঠি! তার নামেই লেখা! বিস্ময়ের ঘোরে শ্যানডন অনেকক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়ে থেকে ডক্টর, জেমস, ওয়াল ও জনসনকে ডেকে আনল।

খাম ছিঁড়ে চিঠিটা পড়ল শ্যানডন: সাম্প্রতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় নাবিক আর অফিসারদের সাহসিকতায় ফরওয়ার্ডের ক্যাপ্টেন খুশি হয়েছেন। শ্যানডন যেন নাবিকদের ক্যাপ্টেনের অভিনন্দন জানিয়ে দেয়।

তারপর আছে, আরও উত্তরে মেলভিল উপসাগরের দিকে রওনা হয়ে সেখান থেকে স্মিথ সাউন্ডের দিকে যাবার নির্দেশ। চিঠিটা ৩০ এপ্রিল অর্থাৎ আজই লেখা।

চিঠিটা পড়া হল। সবার মুখ থমথমে। সবাই বুঝে ফেলেছে, ক্যাপ্টেন এই জাহাজেই আছেন। কিন্তু শ্যানডন কিছুতেই এ কথা মানতে পারছে না। জাহাজের প্রত্যেকেই তার বিশেষ পরিচিত। তবে জাহাজেরই কেউ ক্যাপ্টেন হয় কি করে?

তাহলে চিঠিটা লিখল কে? কুসংস্কারাচ্ছন্ন নাবিকদের মনে আবার সেই সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এ কি তাহলে কুকুরটার কাজ?

এসব নানান জল্পনা-কল্পনার মাঝেই জাহাজ এগিয়ে চলেছে। দিন দিন তাপমাত্রা নেমে যাচ্ছে। ১ মে সে তাপমাত্রা শূন্য তাপাঙ্কের পঁচিশ ডিগ্রি নিচে নেমে গেল।

আবার বরফ ভেসে বেড়াতে শুরু করেছে চারদিকে। বড় একটা হিমশিলার একটা ভালুক আর দুটো বাচ্চাকে দেখে বন্দুক হাতে সেদিকে ছুটলেন ডক্টর ক্লবোনি। ভালুক-মা বিপদ আঁচ করতে পেরে বাচ্চাসমেত গা-ঢাকা দিল।

রাতে বহু দূরে ডিস্কো পাহাড় ভেসে উঠতেই আবার ডক্টরকে অন্যমনস্ক দেখা গেল। এই ডিস্কো দ্বীপের আর এক নাম তিমি দ্বীপ। এখান থেকেই শেষ চিঠি লিখেছিলেন স্যার জন ফ্রাঙ্কলিন। সেটা ১৮৪৫ সালের ১২ জুলাইয়ের কথা।

ডিস্কো দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছুতেই জাহাজের আশেপাশে তিমি মাছের আনাগোনা শুরু হল। পাখনাওয়ালা তিমিরা স্পাউটের ফুটো দিয়ে ফোয়ারার মত পানি ছিটিয়ে খেলতে লাগল।

যতই দিন যাচ্ছে সূর্য যেন আর ডুবতেই চায় না। দিগন্ত রেখা ঘেঁষে কেবল সরে যাচ্ছে। ৩ মে অনভ্যস্ত নাবিকের মনে একটানা এরকম সূর্য দেখে কি প্রতিক্রিয়া হবে ভেবে শঙ্কিত হলেন ডক্টর। নাবিকেরা প্রথম প্রথম একটানা সূর্যের আলো দেখে অবাক হল, পরে বিরক্ত ও শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ওরা মর্মে মর্মে অনুভব করল যে আঁধার আছে বলেই আলো এত আনন্দময়।

৬ মে সবচাইতে উত্তরে এস্কিমোদের রাজ্যে জাহাজ পৌঁছল। এস্কিমো গভর্নর সপরিবারে অভ্যর্থনা জানাতে এলেন। শ্যানডন, ডক্টর ক্লবোনি ও মাত্র তিনজন নাবিক জাহাজ থেকে নামল। পাঁচজনই গর্ভনরের সঙ্গে এগিয়ে গেল। শুধু গভর্নরের বাড়িটিই কাঠের। আর বাকি সবাই থাকে এস্কিমোদের ঐতিহ্যবাহী বরফের তৈরি ঘর–ইগলুতে। ইগলুর গড়ন বড় আজব ধরনের। সরু সুড়ঙ্গের মত পথ বেয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। কোন জানালা নেই। একটা ফুটো আছে ছাদে, ধোঁয়া বার হবার জন্যে। ঘরে ঢুকলে বোটকা গন্ধে পেটের সবকিছু উগরে বেরিয়ে আসতে চায়। সীল মাছের মাংস, পচা মাছ আর এস্কিমোদের শরীরের বিদঘুটে গন্ধ, সব মিলে যাচ্ছেতাই এক অবস্থা।

এস্কিমোদের 'এস্কিমো' বলে ডাকলে তারা ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়। এস্কিমো শব্দের অর্থ হচ্ছে 'কাঁচা মাছ খেকো'। ডক্টর ক্লবোনি তাই ওদের একটু তোয়াজ করার জন্যে 'গ্রীনল্যান্ডবাসী' বলে সম্বোধন করলেন। এস্কিমোরা বেজায় খুশি হল। ওদের ইগলু পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনল ডক্টরকে। ইগলুর ভেতরের বোটকা গন্ধে তাঁর অবস্থা কাহিল হলেও ডক্টর আগ্রহের সঙ্গেই সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখলেন। তাদের কথাবার্তা চলল জাহাজের দোভাষীর জানা মাত্র কুড়িটা এস্কিমো শব্দ আর আকার-ইঙ্গিতের মাধ্যমে।

শ্যানডন জানে এখানে ক্যাপ্টেনের খোঁজ করে কোন লাভই নেই। তবুও মনকে সান্ত্বনা দিতে খোঁজ নিল এ অঞ্চলে তিমি ধরা বা অন্য কোন জাহাজ এসেছিল কিনা। জানা গেল আসেনি। অগত্যা নিরুপায় হয়ে শ্যানডন জানিয়ে দিল, মেলভিল

সাউন্ডেও যদি ক্যাপ্টেনের দেখা না মেলে তাহলে সে নিজেই ফরওয়ার্ডের ক্যাপ্টেন হয়ে বসবে।

গত ক'দিন ধরে লবণ মাখানো মাংস খেতে খেতে অরুচি ধরে গেছে সবার। স্ট্রং তাই আইডার হাঁসের কতগুলো ডিম জোগাড় করে আনল। সবুজ রঙের এই ডিমগুলো আকারে বেশ বড়। ওমলেট খেতে ভালই লাগবে।

পরদিন আবার জাহাজ ছাড়ল। ক্যাপ্টেনের সাক্ষাৎ পাবার আশায় শ্যানডন ঘণ্টায় ঘণ্টায় কামান দেগে সঙ্কেত দিয়ে চলল কিন্তু কোন উত্তর পেল না ওরা।

ডাঙা থেকে জাহাজে তোলা হয়েছে কুড়িটা কুকুর আর একটা স্লেজ গাড়ি। কুকুরগুলো হিংস্র জাতের হলেও জাহাজের ভাল ভাল খাবার পেয়ে শান্তই আছে। ডেনিশ কুকুরটিকেও অন্য কুকুরগুলোর ব্যাপারে উত্তেজিত দেখাল না।

এদিকে আবার বরফ জমতে শুরু করেছে। চারদিক থেকে ভেসে আসা বরফ জাহাজকে বারবার ঘিরে ধরছে। সামনে যাবার পথও হিমশিলার জন্যে প্রায় বন্ধ। অবস্থা দেখে নাবিকদের মনোবল ভেঙে যাচ্ছে। ভয়, উদ্বেগ, কুসংস্কার, সবকিছু মিলিয়ে ওদের মাঝে অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কিছুতেই আর এগুতে চায় না ওরা। কিন্তু একরোখা শ্যানডন কিছুই শুনতে রাজি নয়। তার এক কথা, জাহাজ সামনে এগোবে।

মে'র আট তারিখ থেকে ১৬ মে পর্যন্ত জাহাজ মাত্র দুমাইল পথ পার হল। ছ'সাত ফুট বরফ করাত দিয়ে কাটা যায় না। বরফে নোঙর আটকে ক্যাপস্টান ঘুরিয়ে গুণ টেনে চালাতে হচ্ছে। এত কিছুর পরেও জাহাজটা এগোচ্ছে খুবই ধীর গতিতে।

এখন কি করা যায়? ডক্টর ক্লবোনি বরফের ওপর নেমে পড়লেন সবকিছু ভাল করে দেখবার জন্যে। নেমেই ডক্টর পড়লেন আলোক প্রতিসরণের ধাঁধায়। ডক্টর যেখানে মনে করছেন এক ফুট লাফ দিলেই গর্ত পেরুনো যাবে সেখানে হয়ত পাঁচ-ছয় ফুট লাফানর দরকার। আবার যেখানে মনে হচ্ছে চার-পাঁচ ফুট গর্ত সেটা আসলে এক ফুটেরও কম। যাই হোক ডক্টর খুব সতর্কতার সঙ্গে চারদিক পর্যবেক্ষণ করে ফিরে আসলেন।

ডক্টর বললেন, 'যুগ যুগ ধরে এ অঞ্চলে প্রকৃতি যে কি নিয়মে চলে বৈজ্ঞানিকরা আজও তা ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেনি। ১৮১৭ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চল ছিল শুধু বরফ আর বরফ। বরফে সমুদ্র পথ ছিল বন্ধ। হঠাৎ এক প্রলয়ে সব বরফ সরে যায়। তিমি শিকারিদের মরশুমের সূচনা হয় বাফিন উপসাগরে। কিন্তু গত বছর থেকে প্রকৃতি তার রূপ বদলাতে শুরু করেছে। বরফ জমা শুরু হয়েছে। আবার সেই ভয়াবহ বরফের রাজত্ব ফিরে আসছে।'

ডক্টরের বক্তব্যে অন্য ইঙ্গিত আছে ভেবে শ্যানডন জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কি আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত?'

'ফিরে যাওয়া, পিছু হটা, এসব কাকে বলে আমি জানি না।' দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে উত্তর দিয়ে গ্যারীকে তার অভিমত জানাতে বললেন ডক্টর। গ্যারীও পিছু হটবার লোক নয়। সে-ও চায়। যত আপদ বিপদই আসুক না কেন অভিযান এগিয়ে চলুক। অজানাকে জানতে হবে তার।

পাঁচ

ডক্টর ক্লবোনি অনিশ্চিত অবস্থায় বসে থাকবার লোক নন। তিনি গ্যারী আর শ্যানডনকে নিয়ে আবার নেমে পড়লেন বরফের ওপর। এগোবার রাস্তা খুঁজে বার করতেই হবে।

ডক্টররা নেমে যেতেই নাবিকেরা এক কাণ্ড করে বসল। ওদের বদ্ধ ধারণা সব বিপদের মূলই হচ্ছে কুকুরটা। ওকে মারলে বা ফেলে দিলেই ওদের সব বিপদ কেটে যাবে। শ্যানডনও আর একরোখামি না করে ফিরে যাবে। যেই ভাবা সেই কাজ। ডেকের উপর থেকে ঘুমন্ত কুকুরটার মুখ আর পা বেঁধে উঠিয়ে নিয়ে আসা হল। দূরে একটা বরফের ফোকর দেখে সেখানে ছুঁড়ে ফেলা হল কুকুরটাকে। তারপর বরফ দিয়ে ফুটোটা বন্ধ করে জ্যান্ত কবর দিয়ে ফিরে এল সবাই। চুপিসারে কাজ সারল ওরা। এমনকি জনসনও জানতে পারল না।

বেশ অনেকক্ষণ পরে শ্যানডন ফিরল। মাইল দুই সামনে একটা বরফের ফাঁক পাওয়া গেছে। কোনমতে বরফ ভেঙে অথবা কেটে ওই পথটুকু যেতে পারলেই আর কোন বাধাই থাকবে না। উত্তরের দিকে এগোনো যাবে বিনা বাধায়।

নাবিকেরা শ্যানডনের নির্দেশে বরফ কাটা শুরু করল বটে, কিন্তু বেশ বোঝা গেল ভেতরে ভেতরে ওদের একটা চাপা আক্রোশ রয়েছে। কেউ কোন প্রতিবাদ না করলেও শ্যানডন বুঝল, এই নীরবতা বিপদেরই পূর্বাভাস।

এমনি অস্বস্তিকর পরিবেশের মাঝেই আরও দুদিন কাটল। আঠারো তারিখে ফরওয়ার্ডের সবাই অবাক হয়ে দেখল, কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ভেসে উঠেছে অদ্ভুত আকৃতির এক পর্বত শৃঙ্গ। বড় অদ্ভুত জায়গা এটা। এখানেই আগেকার অনেক নাবিকই মাসের পর মাস বরফের মাঝে আটকা পড়ে থেকেছে।

বরফ কেটে অতিকষ্টে অল্প অল্প করে এগোচ্ছে ওরা। দিনটা কাটল কোনভাবে। পরদিন শনিবার। সকাল থেকেই জোর বাতাস বইছে। কুয়াশার মধ্যে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে আবার কুয়াশায় মিলিয়ে যাচ্ছে বিকট আকৃতির পর্বত-চূড়াটা। হঠাৎ জাহাজের নাবিকদের বাঁচাও বাঁচাও চিৎকারে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল। সেই অদ্ভুত আকৃতির পাহাড়ের চূড়াটা হঠাৎ দানবিক আকৃতি নিয়ে নাবিকদের ওপর ভেঙে পড়বে বলে মনে হচ্ছে। সবার হৈ-চৈ ছাপিয়ে ডক্টরের চিৎকার শোনা গেল, 'ভয় পেয়ো না! এটা আলোর ভেলকি মাত্র।'

ক্লবোনির কথা শেষ হতে না হতেই একটা দমকা হাওয়ায় সেই বিভীষিকা একপলকে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

আবার শুরু হল বরফ কেটে, গুণ টেনে, সামনে চলা। কিছুটা সময় যেতেই আবার প্রচণ্ড হট্টগোল শোনা গেল। নাবিকেরা প্রাণভয়ে গুণ-টুন সব ফেলে ছুটে আসছে জাহাজের দিকে। ওদের পেছনে ধাওয়া করে ছুটে আসছে অতিকায় এক চারপেয়ে জন্তু। কম করে হলেও বিশ ফুট উঁচু হবে। ওর লেজটাই দশ ফুট লম্বা।

কেউ চিৎকার করছে: ভালুক! ভালুক!

আবার কেউ: ড্রাগন! ড্রাগন!

গুড়ুম গুড়ুম করে গর্জে উঠল ডক্টর আর শ্যানডনের বন্দুক। সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হল সেই ভালুক বা ড্রাগনটা। এমন সময় দেখা গেল দৌড়াতে দৌড়াতে এসে পৌঁছুল ফেলে দেয়া সেই ডেনিশ কুকুরটা। বরফের ফুটোতে জ্যান্ত কবর দিয়েও কুকুরটাকে মারা গেল না। অন্য ফুটো বের করে ঠিকই উঠে এসেছে সে। বরফের ওপর আলোর প্রতিসরণে কুকুরটাকেই মনে হচ্ছিল যেন প্রাগৈতিকহাসিক কোন দানব বুঝি ছুটে আসছে!

কুকুরের পুনরার্বিভাব (নাবিকদের মতে শয়তানের পুনরার্বিভাব) ওদের মনোবল একদম ভেঙে দিল। যারা কুকুরটাকে বেঁধে ফেলে দিয়ে এসেছিল তাদের আরও বেশি ভয়। এবার আর কারও ফিরে যাওয়া হবে না। সবাইকে প্রাণ হারাতে হবে!

বরফে কিছুটা ফাঁক পেয়ে ফরওয়ার্ড এঞ্জিনে চালাচ্ছে শ্যানডন। আর জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে আসছে সেই ডেনিশ কুকুর। মঝে মাঝে পিছিয়ে পড়লেই জাহাজ থেকে কে যেন শিস দিয়ে কুকুরটাকে ডাকে আর সঙ্গে সঙ্গেই সে দ্বিগুণ উৎসাহে ছোটা শুরু করে।

জাহাজের ভেতর থেকে শিস শুনে নাবিকেরা সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করল। ফিসফাস শুরু হল ওদের মধ্যে। অনেক হয়েছে। অজানা, অনিশ্চিত পথে আর এক পা'ও তারা যেতে রাজি নয়। এ নির্ঘাত শয়তানের কাজ। ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ফরওয়ার্ডকে। কিছুতেই আর যাওয়া চলে না। নাবিকেরা বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নিল।

এই সময়েই শ্যানডন দূরবীনে দেখতে পেল প্রায় ১৮০০ ফুট ব্যাসের একটা বিরাট হিমশিলা আর কিছুক্ষণ পরেই ফরওয়ার্ডের পথ আটকে দেবে। শ্যানডন ভাবছে কিভাবে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। আর তখনি বোল্টন তার দলবল নিয়ে হাজির হল। কাঁপা গলায় জানাল, 'কম্যান্ডার, আমরা ফিরে যেতে চাই। আমরা আর সামনে এগোব না।'

'কি বললে?' চিৎকার করে উঠল শ্যানডন।

'আমরা আর এক ইঞ্চিও এগোব না,' বোল্টন নির্বিকার।

শ্যানডন এগিয়ে যাচ্ছিল বোল্টনকে উচিত শিক্ষা দিতে। কিন্তু এই সময়ে ছুটে এল তার মেট। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, 'এক মুহূর্ত দেরি করলে জাহাজ আর বের হতে পারবে না। ওই দেখুন কি ভয়ঙ্কর অবস্থা!'

শ্যানডন দেখল, একটা বিরাট হিমশিলা ভাসতে ভাসতে বেরুনর পথের দিকে এগিয়ে আসছে। মুখটা বন্ধ হয়ে গেলেই সব শেষ। ভরাট গলায় হুঙ্কার ছেড়ে সবাইকে যার যার জায়গায় যেতে হুকুম করল শ্যানডন। হতচকিত নাবিকেরা ছুটে গেল বিপদ মোকাবিলায়। ফুলস্পীডে ফরওয়ার্ড ছুটে চলল। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হল না। বরফের গতির কাছে হার মানল জাহাজ। বোতলের মুখে ছিপি আটকানর মত বের হবার পথ বন্ধ করে দিল উত্তর দিক থেকে ভেসে আসা বরফ-পাহাড়।

সব আশা-ভরসা শেষ। হতাশ হয়ে পড়ল শ্যানডন।

হঠাৎ নাবিকেরা উন্মত্ত হয়ে উঠল। ওদের হৈ হুল্লোড়ে তুমুল কাণ্ড বেধে গেল জাহাজে।

'পালাও! নৌকা নামাও! মদের ভাঁড়ার লুট কর! খাবার লুট কর!' নাবিকদের বিশৃঙ্খলায় হতবাক শ্যানডন। হতবাক ডক্টর ক্লবোনিও। ওরা কেউ ভাবতেও পারেনি নাবিকেরা হঠাৎ এভাবে বিদ্রোহ করে বসবে।

অকস্মাৎ হট্টগোল ছাপিয়ে একটা বজ্র গম্ভীর আদেশ শোনা গেল। 'সবাই যার যার জায়গায় যাও! জাহাজ ঘোরাও!'

যাদুর মত কাজ হল ওই কণ্ঠস্বরে। তৎক্ষণাৎ জাহাজ ঘুরিয়ে দিল জনসন্ন। নাবিকেরাও মন্ত্রমুগ্ধের মত যে যার জায়গায় ছুটে গেল।

কিন্তু কে? কে এই হুকুম দিল? কার এই কণ্ঠস্বর?

পরক্ষণেই ক্যাপ্টেনের কেবিনের দরজা খুলে গেল। জমকালো পোশাকে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। বাইরে এসেই তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে উঠলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে যেন কুকুরটা দৌড়ে এসে ক্যাপ্টেনের পায়ের কাছে মুখ ঘষে লেজ নাড়তে লাগল। হ্যাঁ, ইনিই তো ক্যাপ্টেন। তাহলে ক্যাপ্টেন রহস্যের সমাধান হল!

ছয়

ক্যাপ্টেনকে তার কেবিন থেকে বেরুতে দেখেই 'স্যার' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল শ্যানডন। পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে অবাক কণ্ঠে বলল, 'গ্যারী! তুমি…!'

সবাই দেখল লম্বা জুলপি দিয়ে এতদিন ঢাকা ছিল ওর মুখ। আজ জুলপি কেটে ফেলায় তার মুখে গাম্ভীর্যময় একটা ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। দেখলে মনে হয় যেন গ্যারীর জন্মই হয়েছে শুধু হুকুম দেবার জন্যে। হতভম্ব নাবিকেরা বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই চেঁচিয়ে উঠল, 'থ্রী চিয়ার্স ফর ক্যাপ্টেন।'

ডেকে এসে ক্যাপ্টেন সবাইকে ডাকবার জন্যে শ্যানডনকে নির্দেশ দিলেন। ডাক শুনে সবাই এসে পড়ল ডেকে। ক্যাপ্টেন কি বলেন তা শোনার জন্যে সকলে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ভাল করে একনজর সবাইকে দেখে নিয়ে ক্যাপ্টেন আস্তে আস্তে শুরু করলেন, 'আমি একজন ইংরেজ সন্তান। আমি দেশের পতাকা এমন জায়গায় উড়িয়ে আসতে চাই যেখানে এর আগে আর কারও পদার্পণ ঘটেনি। সুমেরুতে আমি ইংরেজ পতাকা ওড়াতে চাই। টাকার জন্যে কোন চিন্তা নেই। প্রয়োজনমত খরচ করব আমি। এ কাজ শুধু টাকা দিয়ে হয় না। চাই দৃঢ় মনোবল ও দেশপ্রেম। আমি আপনাদের অনেক টাকা দেব। আমরা এখন আছি বাহাত্তুর ডিগ্রিতে। প্রতি ডিগ্রি উত্তরে এগুনর জন্য আপনারা সবাই এক হাজার পাউন্ড করে পুরস্কার পাবেন। মনে রাখবেন, আমিই ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস!

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের নাম শোনেনি এমন ইংরেজ কমই আছে। বিশেষ করে নাবিকদের কাছে তিনি এক বিস্ময়। অজেয়কে জয় করার উন্মাদনায় একবার পেয়ে বসলে কারুরই সাধ্য নেই তাকে ফিরিয়ে আনে। তার সঙ্গে অভিযানে যেতে হবে শুনলেই নাবিকেরা শিউরে ওঠে। পৈতৃক সূত্রে প্রচুর ধন-দৌলতের মালিক এই জন হ্যাটেরাস। হ্যাটেরাসের বাবা ছিলেন মদের ব্যবসায়ী। মৃত্যুকালে তিনি ছেলের জন্যে রেখে যান নগদ ষাট লক্ষ পাউন্ড আর অগাধ সম্পত্তি। অসম সাহসী হ্যাটেরাস অসংখ্য অ্যাডভেঞ্চারে প্রচুর টাকা খুইয়েছেন, অথচ আবিষ্কারের নেশাটা এখনও আগের মতই তরতাজা রয়েছে।

হ্যাটেরাসের জীবনে একটাই দুঃখ–অজানা অজ্ঞাত দেশ আবিষ্কারে ইংরেজরা অনেক পিছনে পড়ে আছে। আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন কলম্বাস, একজন ইহুদী। ভাস্কোডাগামা ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছেন–তিনি জাতে পর্তুগীজ। চীনও আবিষ্কার করেছেন পর্তুগীজ ফার্নান্ডো ডি আনড্রাডা। কানাডা আবিষ্কার করেছেন ফরাসী জ্যাকুইস কার্টার। কিন্তু সেই তুলনায় ইংরেজদের তেমন কোন দুঃসাহসিক আবিষ্কার নেই। তারা কেবল কলোনি করেছে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা ও ভারতবর্ষে। এতে সুনামের চাইতে দুর্নামই হয়েছে বেশি। ইরেজদের এই কলঙ্ক যে করেই হোক ঘুচাতে হবে। তাই তিনি এমন জায়গা আবিষ্কার করতে চান যা দেখে সারা দুনিয়ার সব লোকের তাক লেগে যাবে।

ইংরেজদের কলঙ্ক ঘুচাতে হ্যাটেরাস দক্ষিণ সাগরে বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করে বাফিন উপসাগরে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। সেটা ১৮৪৬ সালের কথা। জাহাজের নাম ছিল 'হ্যালিফ্যাক্স'। ওই অভিযানে হ্যাটেরাসের পাগলামো চরমে পৌঁছেছিল। নাবিকদের যে কি অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল তা ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। হ্যাটেরাসকে তাই নাবিকদের এত ভয়। তাঁর সঙ্গে অভিযানের কথা ভুলেও কেউ মুখে আনে না। তবুও টাকার লোভ দেখিয়ে 'ফেয়ারওয়েল' জাহাজে বেশ ক'জন দুঃসাহসী নাবিক নিয়ে আবার ১৮৫০ সালে উত্তরে রওনা হয়েছিলেন তিনি। বরফ সমুদ্রে ধ্বংস হল ফেয়ারওয়েল জাহাজ। নাবিকদের একজনও বাঁচেনি। শুধুমাত্র হ্যাটেরাস বরফের উপর দুশো মাইল পায়ে হেঁটে, কোনমতে প্রাণে বেঁচে যান। পরে ভাগ্যগুণে এক তিমি-শিকারির জাহাজে দেশে ফিরতে পেরেছিলেন।

সেই থেকেই হ্যাটেরাসকে নিয়ে নানান জল্পনা-কল্পনার আর শেষ নেই। তিনি কি মানুষ না আর কিছু? বদ্ধ উন্মাদ, নাকি খ্যাপা ক্যাপ্টেন?

ফেয়ারওয়েল অভিযানের পর তাঁর সম্পর্কে এক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল নাবিকদের মাঝে। তাই অঢেল টাকার লোভ দেখিয়েও আর কোন সঙ্গী জোগাড় করতে পারলেন না তাঁর পরবর্তী অভিযানের জন্য। তাই দুবছর ছদ্মবেশে লিভারপুলে থাকলেন। মিশলেন নাবিকদের সঙ্গে। রিচার্ড শ্যানডনকে মনে ধরল তাঁর। বেনামী চিঠি লিখে শ্যানডনকে দিয়ে তৈরি করালেন ফরওয়ার্ড। আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলেন; প্রয়োজন না পড়লে, চরম সঙ্কট না এলে, নিজেকে প্রকাশ করবেন না। শুরু হল ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের নতুন অভিযান। জাহাজে ক্যাপ্টেন থেকেও ছিল না।

বিনা ক্যাপ্টেনেই এগিয়ে চলছিল জাহাজ।

সাত

ফরওয়ার্ডের ক্যাপ্টেনকে পেয়ে সবারই খুশি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি যে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস হবেন তা কেউ চায়নি বা ভাবতেও পারেনি। তাই তাঁর নাটকীয় আবির্ভাবে নাবিকেরা কেউই খুব একটা খুশি হয়েছে বলে মনে হল না। সবাই তাঁর একরোখা স্বভাবের কথা জানে। আর এটাও জানে যে, তাঁর কথামত না চললে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

পরদিনই ডক্টর, শ্যানডন ও জনসনকে নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে সেই আলোচনায় বসলেন হ্যাটেরাস। বরফ আর বরফ, চারদিক থেকে সামনে চলার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। তবুও ক্যাপ্টেন কোন কথাই শুনতে রাজি নন। তাঁর একই কথা, এগিয়ে যেতেই হবে। আগে যে সব অভিযাত্রীরা এসেছে তারা উত্তর মেরুতে যেতে না পারলেও বরফ-শূন্য সমুদ্র দেখেছে। সুতরাং আর চিন্তা কি? শ্যানডন যদিও কিছুটা প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু হ্যাটেরাসের পক্ষ নিয়ে ডক্টর যেভাবে সমর্থন করলেন তাতে ওর আর কিছুই বলার থাকল না। ক্যাপ্টেন নিজে নেমে বরফের অবরোধ ভাল করে পরীক্ষা করে এলেন। তারপর বরফের ওপর হাজার পাউন্ড বিস্ফোরক ক্ষমতার মাইন পুঁতে বরফের স্তূপ ভাঙার চেষ্টা করলেন। জনসন সলতেয় আগুন লাগিয়ে জাহাজে ফিরে এল। প্রচণ্ড শব্দে বরফের ভিতর মাইন বিস্ফোরিত হল। কিন্তু পথ পরিষ্কার হল না। আলগা বরফ আটকে রইল যাবার পথে। হ্যাটেরাসের মাথায় নতুন বুদ্ধি খেলল। কামানে গোলার বদলে তিনগুণ বারুদ ভরে ফরওয়ার্ডকে সামনের দিকে চালানর নির্দেশ দিলেন তিনি।

হ্যাটেরাসের কাণ্ড দেখে সবাই অবাক। কি করতে চান ক্যাপ্টেন?

জাহাজ বরফ স্তূপের বেশ কাছাকাছি আসতেই ক্যাপ্টেন কামান দাগার আদেশ দিলেন। কামানের ফাঁকা আওয়াজে বাতাসে যে আলোড়ন সৃষ্টি হল তাতে ক্ষণিকের জন্যে পথটা খুলে গেল। ফরওয়ার্ডও দ্রুত সেই ফাঁক গলে বের হয়ে এল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার আর একটু সামনে আলগা বরফ জোড়া লেগে জাহাজের পথ রোধ করে দাঁড়াল। কিন্তু ক্যাপ্টেন পিছু হটার লোক নন। কখনও ডিনামাইট ফাটিয়ে, কখনও বা করাত দিয়ে কেটে, কিংবা জাহাজ দিয়ে ধাক্কা মেরে ঠেলে, অসম্ভবকে সম্ভব করে এগিয়ে চললেন তিনি। এভাবেই বরফের সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধ করে ২৭ মে ফরওয়ার্ড নিয়ে লিওপোল্ড বন্দরে পৌঁছলেন ক্যাপ্টেন। বন্দরে নেমেই গত অভিযানের নাবিকদের কিছু চিহ্ন খুঁজে পেলেন। বরফে চাপা দেয়া দুটি কবর পেলেন। জেমস রসের উদ্বাস্তু শিবিরেরও সন্ধান পেলেন তিনি। সেখানে খাবার-দাবার, জ্বালানী এবং প্রয়োজনীয় আরও অনেক কিছু মজুত আছে। রস এই শিবির করেছিলেন ভবিষ্যতের কথা ভেবে। কখনও কোন অভিযাত্রী বিপদে পড়লে, বা তাদের রসদ শেষ হয়ে গেলে তারা যেন এখান থেকে সাহায্য নিতে পারে। ফ্রাঙ্কলিন

তাঁর দলবল নিয়ে এত দূর পর্যন্ত পৌছতে পারেননি। পারলে সবাই বেঁচে যেত।

শিবিরে যা কিছু পাওয়া গেল সব জাহাজে তোলার পর ডক্টর ক্লবোনি লিওপোল্ড বন্দরে তাঁদের পদার্পণের কোন নিশানা রেখে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু পাছে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অভিযাত্রীরা টের পেয়ে যায় এই ভয়ে ক্যাপ্টেন কিছুতেই তাতে রাজি হলেন না। আবার যাত্রা শুরু হল।

বিরামহীন বরফ ভাঙা যে কি কষ্টের আর বিরক্তিকর তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানে। নাবিকেরা ক্রমেই ক্লান্তি ও একঘেয়েমিতে উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলছে। এরই মাঝে দুটো তিমি মাছ, সূর্যকে ঘিরে নকল সূর্যের মত জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি করে নাবিকদের চলার পথে কিছুটা বৈচিত্র্যের আমেজ এনে দিল। অপূর্ব সুন্দর জ্যোতির্বলয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছেন টমাস ইয়ং। বরফ প্রিজম মেঘের আকারে যখন শূন্যে ভাসে তখনই সূর্যালোকে এই মায়াবী ইন্দ্রজালের সৃষ্টি হয়।

শুরুতে নাবিকেরা বেঁকে বসেছিল। ক্যাপ্টেন তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করে নিতে না নিতেই এবার অফিসারদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিল। এমন কি শ্যানডনও ক্যাপ্টেনের গোঁয়ার্তুমি আর পছন্দ করছে না। সামনে এগোনো প্রায় অসম্ভব, কিন্তু ক্যাপ্টেনের সেই একই কথা, জাহাজ সামনেই এগোবে। অফিসারদের অসন্তোষের মাঝেই জুন মাসের আট তারিখে ফরওয়ার্ড পৌছল ভুঠিয়াল্যান্ড। জেমস রস এই ভুঠিয়াল্যান্ডেই ম্যাগনেটিক পোলের সন্ধান পেয়েছিলেন। কম্পাসের কাঁটা এ জায়গায় মাটির সঙ্গে সমান্তরাল না থেকে খাড়া হয়ে থাকে। তারমানে চুম্বক পাহাড় বলে আসলে কিছুই নেই। লোহার জাহাজ গেলে আছড়ে পড়ে সেই পাহাড়ে, জাহাজের পেরেক ছিটকে বেরিয়ে যায়, সবই কল্প-কাহিনী! মিথ্যা।

আট

জাহাজ যতই এগিয়ে চলছে নাবিকেরাও ততই নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে। মেলভিল উপসাগরে জাহাজ পৌছার পর সবাই দেখল ওখানকার নীল জল মাঝে মাঝে সবুজ দেখাচ্ছে। ডক্টর জানালেন নীল জলে কীটাণু অথবা জেলীফিশ থাকে না বলেই এমন হয়। হার্পুনার সিম্পসনও সমুদ্র সম্পর্কে বেশ জ্ঞান রাখে। সে বলল, সমুদ্রে যে তেলতেলে জিনিস ভেসে বেড়াচ্ছে তার মানে হল কোন তিমি খানিকক্ষণ আগে এ পথ ধরে গেছে। হার্পুনারের কথাই সত্যি হল। একটু পরেই জাহাজের সামনের দিক থেকে কেউ চিৎকার করে বলল, দূরে তিমি দেখা যাচ্ছে।

সেদিন তিমি শিকার করতে গিয়ে ওদের ক'জন মস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পেল। নৌকা করে ওরা তিমি শিকার করতে গিয়ে একটাকে হার্পুন দিয়ে গেঁথে ফেলতেই প্রায় ১৩০ ফুট লম্বা তিমিটা হার্পুনের দড়ি সমেত নৌকাটাকে টানতে টানতে সামনে এগিয়ে চলল। ঠিক এমনি সময়ে দুদিক থেকে দুটো বরফ-পাহাড় ভাসতে ভাসতে এসে ভীষণ আওয়াজে এক হয়ে গেল। হার্পুনের দড়ি কেটে দেয়ায় নৌকা ও যাত্রীরা

অল্পের জন্য রক্ষা পেলেও প্রকাণ্ড তিমিটা বরফ-পাহাড়ের ধাক্কায় একদম থেঁতলে গেল।

এরপর জুলাই মাসের তিন তারিখে বীচি দ্বীপে এসে পৌঁছলেন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস। ভবিষ্যতে অভিযাত্রীরা যেন অনাহারে না মরে তাই ১৮৫৩ সালে প্রচুর খাবার-দাবার এনে রাখা হয়েছিল এই দ্বীপে। বছরের পর বছর বরফে খাবার থাকলেও তা নষ্ট হয় না। ক্যাপ্টেন কিন্তু এখানকার খাবার সামগ্রী সংগ্রহে একটুও আগ্রহী নন। তাঁর জাহাজে যে পরিমাণ খাদ্য আছে তাতে বেশ ক'বছর চলে যাবে। ক্যাপ্টেন চিন্তিত কয়লার জন্যে।

এই সেই বীচি দ্বীপ যেখানে মেরু অভিযানের কিংবদন্তীর নায়ক ফ্রাঙ্কলিন অজানা আবিষ্কারের নেশায় সঙ্গীসহ নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। তাঁরই স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি কালো মার্বেলের স্মৃতিসৌধ বানিয়েছে পরের অভিযাত্রীরা।

ফ্রাঙ্কলিনের স্মৃতিসৌধের সামনে কিছুটা সময় কাটিয়ে সবাই কয়লা খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথাও কয়লা বা সঞ্চিত খাবারের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া গেল না। এক জায়গায় তিনটা মাটির ঢিবিতে ফ্রাঙ্কলিনের তিন সঙ্গীদের কবর আর দূরে একটা ছেঁড়া তাঁবু, ভাঙা লোহা আর কাঠের কয়েকটা টুকরো দেখতে পেলেন ক্যাপ্টেন। বুঝতে আর কিছুই বাকি রইল না তার। মরু অভিযাত্রীদের জন্যে রাখা রসদ ভাণ্ডারের খোঁজ পেয়ে নিশ্চয়ই এস্কিমোরা সব লুট করে নিয়েছে। মহা সমস্যায় পড়লেন ক্যাপ্টেন। কয়লা যা মজুত আছে তাতে কিছুতেই মাস দুয়েকের বেশি চলবে না। এখনই কয়লার ব্যবস্থা করতে না পারলে কি যে বিপদ হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

দেখতে দেখতে শীতের প্রকোপ বাড়ছে। চারদিকে আরও বরফ জমতে শুরু করেছে। থার্মোমিটারে পারদ এসেছে শূন্যেরও বাইশ ডিগ্রি নিচে। হ্যাটেরাস দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সমুদ্র যদি পুরোটা জমে যায় তাহলে সারা শীতকাল সবাইকে এখানেই আটকে থাকতে হবে। শীতে জমে মরতে হবে। কিছু একটা করা দরকার। ক্যাপ্টেন জানেন এখন তাঁর পক্ষে আছে মাত্র তিনজন। ডক্টর, জনসন এবং বেল। বাকি চোদ্দজন এমনকি শ্যানডনও এখন তার ঘোর বিরোধী। ওরা কেউই আর সামনে এগিয়ে যেতে চায় না। ওদেরকে অনুরোধ বা আদেশ করেও আর কিছুতেই দাঁড় টানানো যাবে না। উপায় এখন একটাই। জাহাজের বয়লার চালু করার হুকুম দিলেন ক্যাপ্টেন। এখন থেকে স্টীমে চলবে জাহাজ।

ক্যাপ্টেনের আদেশ শুনে সবাই বোকা বনে গেল। কয়লা যা আছে তা দিয়ে জাহাজ চালালে ক'দিনই বা চলবে? তাহলে প্রচণ্ড শীতে আগুন পোহানো যাবে কি করে? জাহাজশুদ্ধ সবাইকে জমে মরতে হবে যে! ক্যাপ্টেনের আদেশ শুনেও তাই কেউই নড়ল না, ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

ক্যাপ্টেন খেপে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'তোমরা কি কানে শোন না? ব্রানটন! যাও, বয়লার চালু কর!'

'না, ব্রানটন, যেয়ো না।' কে যেন বলে উঠল।

'কি? আমার হুকুমের উপর হুকুম। কার এতবড় বুকের পাটা?' ক্যাপ্টেনের

কথা শেষ না হতেই পিছন থেকে ঠেলে এগিয়ে এল পেন।

'আমার! আপনার পাগলামি যথেষ্ট সহ্য করেছি আমরা। অনেক হয়েছে। আর নয়। এবার সোজা বলে দিচ্ছি, আমাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোন অধিকার আপনার নেই। আমরা বয়লারও চালু করব না, আর সামনেও এগোব না।'

যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব দেখিয়ে ঠাণ্ডা গলায় শ্যানডনকে লক্ষ করে ক্যাপ্টেন বললেন, 'পেনকে খাঁচায় বন্দী করে রাখুন।'

'কিন্তু, ক্যাপ্টেন...' শ্যানডন, পেনের পক্ষ নিয়ে কিছু বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু ক্যাপ্টেন তাকে এক হুঙ্কারে থামিয়ে দিলেন।

'পেনের পক্ষ নিয়ে ওকালতি করলে আপনাকেও খাঁচায় যেতে হবে। কি হল, বন্দী করুন পেনকে!'

শ্যানডন হুকুম দিতেই জনসন, বেল আর সিম্পসন পেনকে পাকড়াও করতে এগিয়ে গেল। ওরা এগুতেই পেন একটা লোহার রড মাথার উপর বন বন করে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'খবরদার! যে আমার দিকে এগোবে তাকেই ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দেব!'

এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন নিজেই। হাতে পিস্তল। গলার স্বরকে খাদে নামিয়ে রক্ত হিম করা কণ্ঠে বললেন, 'রডটা ফেলে দাও পেন, নইলে পিস্তলের গুলি তোমার কপাল ফুটো করে দেবে।'

জাহাজসুদ্ধ পিনপতন স্তব্ধতা। সবাই ভয় পেয়ে গেছে হ্যাটেরাসের ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বরে। এমন কি পেনও রড় ফেলে খাঁচায় আবদ্ধ সিংহের মত ফুঁসতে লাগল। সবাই জানে হ্যাটেরাসের অভিধানে অসাধ্য বলে কিছুই নেই। পেনকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল।

কয়লা দিয়ে বয়লার চালু হল। ধীর গতিতে আবার এগিয়ে চলল ফরওয়ার্ড।

নয়

জাহাজের পরিস্থিতি থমথমে। পেনের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের ব্যবহারে সবাই গুম হয়ে আছে। এমনি অসন্তোষের মাঝেই বীচার পয়েন্টে জাহাজ পৌঁছল।

কিন্তু হায়! কোথায় সেই বরফহীন সমুদ্র? হ্যাটেরাস অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে মাস্তুলের মাথায় উঠলেন। যদি কোনদিকে দেখা যায় সেই আকাঙ্ক্ষিত সমুদ্র! কিন্তু সবই দূরাশা! চোখে-মুখে হতাশার ছাপ নিয়ে নেমে এলেন ক্যাপ্টেন।

দিনদিন শীতের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। একদিন সন্ধ্যায় ডেকে দাঁড়িয়ে ডক্টর বললেন, 'দেখ জনসন, শীতের পাখিরাও ঠাণ্ডার ভয়ে কেমন দক্ষিণ দিকে উড়ে যাচ্ছে। ওদের মত পাখা থাকলে এ জাহাজের অনেকেই ওদের সঙ্গী হত।'

জনসনও সায় দিল ডক্টরের কথায়।

১৮ আগস্ট। কুয়াশার আবরণের ভিতর দিয়ে দূরে ব্রিটানিয়া পাহাড়ের আবছা আকৃতি দেখা যাচ্ছে। পরদিনই অর্থাৎ ১৯ আগস্ট নর্দমবারল্যান্ড উপসাগরে যাবার

পথে আবার বরফে আটকে গেল জাহাজ। সাদা বরফের স্তূপ চারদিক থেকে জাহাজটাকে ঘিরে ফেলছে। যেন গিলেই ফেলবে ফরওয়ার্ডকে!

শোনা যায়, এখানে পৌঁছে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলেন স্যার এডোয়ার্ড বেলচার। এই অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে শুধু বরফ আর উত্তর-পশ্চিম দিকে খোলা সমুদ্র–টলটলে নীল জল। কিন্তু হ্যাটেরাস দেখলেন উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম যেদিকেই চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ! কোথায় খোলা সমুদ্র? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ক্যাপ্টেন মনে মনে ভেঙে পড়ছেন। তবু তিনি উত্তর দিকেই এগোবার নির্দেশ দিলেন। ক্যাপ্টেনের নির্দেশ অমান্য করার সাহস আর কারও হল না।

অনেক কসরৎ করে তেরো দিনে পেনী প্রণালীতে পৌঁছল ফরওয়ার্ড। সেখানে নাবিকেরা দেখল, দক্ষিণে যাবার পথ একদম বন্ধ থাকলেও উত্তর দিক কিছুটা খোলা। বিপদের ভয় ওদিকে কিছুটা কম, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের যে পথ পেরোতে লেগেছে পাঁচ মাস, সেই পথ পূর্ববর্তী যাত্রীরা পার হয়েছেন তিন বছরে। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে আর বেশি দেরি নেই। কিন্তু সমুদ্রের যা অবস্থা তাতে আদৌ আর সামনে এগোনো যাবে কিনা সন্দেহ। আর বেশি পথ বাকি নেই ভেবে অজানা একটা আনন্দ অনুভব করছেন হ্যাটেরাস।

৮ সেপ্টেম্বর আবার বরফে আটকে গেল জাহাজ। কামান দেগে বরফ উড়িয়ে পথ করে নিলেন ক্যাপ্টেন। কোন বাধাই আর মানতে রাজি নন তিনি।

সেই রাতেই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়ল ফরওয়ার্ড। বরফের পাহাড়গুলো যেভাবে ঢেউয়ের মাথায় নাচছে তাতে নাবিকদের বুকের রক্ত হিম হয়ে আসার জোগাড়। এমন সময় একটা হিমশিলা প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে এল জাহাজের দিকে।

'গেল, গেল! পালাও, পালাও!' চিৎকার করে উঠল নাবিকেরা!

কিন্তু পালাবে কোথায়?

কামান দেগে বরফের পাহাড়টা ঠেকানর হুকুম দিলেন ক্যাপ্টেন। আদেশ পেয়ে কয়েকবার কামান দাগল নাবিকেরা; কিন্তু কোন ফায়দা হল না। দড়াম করে জাহাজের সামনের গলুইয়ের ওপর আছড়ে পড়ল বরফের পাহাড়। গুঁড়িয়ে গেল সামনেটা। পর মুহূর্তেই আর একটা বরফের চাঁই এসে পড়ল মাস্তুলের উপর। ক্যাপ্টেন চিৎকার করে সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিলেন।

নাবিকেরা সাবধান হবার আগেই দুমদাম শব্দে বরফের প্রকাণ্ড একেকটা টুকরো ভেঙে পড়তে লাগল জাহাজের উপর। বরফের ভারে জাহাজ ডোবে আর কি! শঙ্কিত হয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন। বরফের সঙ্গে গেঁথে আছে জাহাজ। মাস্তুলও ভাঙে ভাঙে অবস্থা। এবার আর রক্ষে নেই।

ঠিক তখনি একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। গলুইয়ের উপর যে বরফ-পাহাড়টা আছড়ে পড়েছিল, সেটার গা থেকে কিছু বরফ খসে পড়তেই ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে পড়ল সেটা সমুদ্রের বুকে। আবার ভেসে উঠল ফরওয়ার্ড। জাহাজের নিচে মড় মড় শব্দে ভাঙল বরফের চাক!

ক্যাপ্টেন দেখলেন, জাহাজের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। একটা হিমবাহ ফরওয়ার্ডকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে গেল সামনের দিকে। কিন্তু ১৫ সেপ্টেম্বর আবার

একটা বরফ প্রান্তরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল জাহাজ। থর থর করে কেঁপে উঠে আটকে গেল ফরওয়ার্ড।

ভৌগোলিকেরা পৃথিবীর সবচেয়ে ঠাণ্ডা বলে মানচিত্রে যে অঞ্চলকে চিহ্নিত করেছেন তা তাঁরা কেউই দেখেননি। হ্যাটেরাস যন্ত্রপাতি দিয়ে মাপ-জোক করে বুঝতে পারলেন এটাই সেই অজানা অঞ্চল। আরও একটা অজ্ঞাত অঞ্চলের সন্ধান পেয়ে হ্যাটেরাসের মন খুশিতে নেচে উঠল।

পৃথিবীর সবচাইতে ঠাণ্ডা অঞ্চলে এসে শুরু হল শীতের সঙ্গে লড়াইয়ের প্রস্তুতি। বরফ প্রান্তরে কিভাবে শীতকাল কাটাতে হয় সে-ব্যাপারে জনসন ও ক্যাপ্টেন দুজনেই অভিজ্ঞ। ওদের অভিজ্ঞতাই তখন একমাত্র সম্বল। কারণ বরফ প্রাচীর যেভাবে চারদিক থেকে জাহাজটাকে আটকে ফেলেছে তাতে শীতকালটা এখানে কাটানো ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

মেরু অঞ্চলে শীতকাল কাটানর কথা ভেবে নাবিকেরা অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। সবাই কম বেশি চিন্তিত হলেও একজনের এ ব্যাপারে কোন বিকার নেই। তিনি ডক্টর ক্লবোনি। সবাই যখন মৃত্যুভয়ে অস্থির, ডক্টর তখন আনন্দে আটখানা। তাঁর মতে, এটা নেহায়েতই কপালের জোর! নইলে মেরু অঞ্চলে শীতকাল কাটাবার সুযোগ ক'জন পায়?

এস্কিমোদের ইগলুর মত করে জাহাজের চারদিকে বরফ দিয়ে আবরণ সৃষ্টি করা হল। তুষার তাপ বহন করে না। জাহাজের ভেতরকার উত্তাপও তাই আর বাইরে বেরুতে পারবে না। বাতাস চলাচলের জন্যে শুধু একটা ফুটো রাখা হল উপরে।

ক্যাপ্টেন সবাইকে নিয়মিত ব্যায়াম করে শরীর গরম রাখতে বললেন। একটা বড় রুমে সারাক্ষণ স্টোভ জ্বালিয়ে রাখা হল। জাহাজশুদ্ধ সবাইকে ওই স্টোভ ঘিরেই বসে কাটাতে হচ্ছে। ক্যাপ্টেনের কড়া নির্দেশ কেউ যেন অলসভাবে গুটিসুটি মেরে বসে না থাকে। তাহলে শীতে ধরে বসবে, অসুখ-বিসুখ করবে। খাওয়া-দাওয়াও সবাইকে বেশি করে করতে বললেন। বিশেষ করে চর্বি জাতীয় খাবার, চা, কোকো ইত্যাদি। ডক্টরও সবাইকে বেশি করে তৈলাক্ত খাবার খেতে বললেন, এভাবেই শীতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেয়া হল।

সারাদিন জাহাজের খোলে বসে থাকা ছাড়া করার কিছুই নেই। সুযোগ পেলেই নাবিকেরা শিকারে বেরিয়ে পড়ে। প্রচুর মেরু-মোরগ তারা প্রতিদিনই মেরে আনে।

যতই দিন যাচ্ছে হ্যাটেরাসের প্রতি নাবিকেদের অসন্তোষ আর রাগ ততই বেড়ে চলেছে।

এরই মাঝে একদিন সবাই ঠিক করল ভালুক মারতে হবে। শীতে গা গরম রাখার জন্যে ভালুকের মাংস আর চর্বি দুটোই অত্যন্ত উপযোগী। গেল সবাই ভালুক মারতে। কিন্তু মেরে আনল একটা শিয়াল। শিকারিদের কোন দোষ নেই। আলোর প্রতিসরণের ভেলকিবাজিতে সাদা শিয়ালকেই মনে হচ্ছিল যেন বিরাট এক সাদা ভালুক। শিকারিরাও ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারেনি। ভালুক মারার আনন্দেই তখন অস্থির সবাই। কিন্তু মড়াটার কাছাকাছি যেতেই ভুল ভাঙল সবার। এতক্ষণ যেটাকে

ভালুক ভেবে উল্লাসে ফেটে পড়েছিল ওরা, সেটা আর কিছুই নয়–একটা সাদা শিয়াল!

শিয়ালটার একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেল। ওর গলায় রয়েছে একটা কলার। তাতে কি যেন লেখা, স্পষ্ট পড়া যায় না। অস্পষ্ট লেখার রহস্য ডক্টর উদঘাটন করলেন। জেমস রস ১৭৪৮ সালে কয়েকটা শিয়ালের গলায় এই কলার পরিয়ে দিয়েছিলেন। এই জাতের শিয়াল খাবারের খোঁজে অনেক দূর পর্যন্ত পাড়ি জমায়। রস ভেবেছিলেন নিশ্চয়ই কারও না কারও হাতে এসব শিয়াল একদিন ধরা পড়বে। আর কলারের লেখা পড়ে তাঁদের উদ্ধারের জন্যে নিশ্চয়ই কোন অভিযাত্রী এগিয়ে আসবেন। এদিকে বারো বছর পার হয়ে গেছে। শিয়ালও ঠিকই ধরা পড়েছে। কিন্তু রস? তিনি আর নেই!

দশ

প্রতিদিন শীতের প্রকোপ ক্রমেই বাড়ছে। ঘরে চব্বিশ ঘণ্টাই আগুন জ্বলে। আগুনের আঁচ একটু কমে এলেই মেঝে, বল্টু, পেরেক সবকিছুতেই বরফ জমা শুরু হয়ে যায়। এমন কি নিঃশ্বাসও জমে যায়। সবাই তাই সারাক্ষণ আগুনের আশেপাশেই থাকে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের হুকুম, কেউ যেন অলসভাবে বসে না থাকে। প্রতিদিনই সবাইকে কিছুটা সময় ডেকে পায়চারি করে, দৌড়াদৌড়ি করে শরীর গরম রাখতে হবে। সবাই হ্যাটেরাসের কথা শুনে চললেও পেন এবং তার বন্ধুরা ক্যাপ্টেনের কথা একদমই মানছে না। ওরা দিনরাত কেবল কম্বল মুড়ি দিয়ে আয়েশ করে কাটায়। এর ফল ফলতে বেশি দেরি হল না। মাত্র ক'দিন যেতে না যেতেই ওদের সবার স্কার্ভি রোগ দেখা দিল। হাত-পা ফুলে, নীল আর কালো ছোপে সারা শরীর ছেয়ে গেল। সেই সঙ্গে অসহ্য ব্যথা আর কষ্ট। ওদের ছটফটানি দেখে বড্ড খারাপ লাগে।

ক্যাপ্টেন কয়লা বাঁচানর জন্যে নিজের কেবিনে আগুন না জ্বেলে বড় রুমটায় এসে আগুন পোহান। তাঁর উপস্থিতি সাধারণ নাবিকেরা কেউই সহ্য করতে পারে না। সবাই তাঁর দিকে ঘৃণা আর বিদ্বেষের চোখে তাকায়। ক্যাপ্টেন এসব ভ্রূক্ষেপ না করলেও এটা ঠিকই উপলব্ধি করতেন যে নাবিকেরা কেউই তাঁকে সহ্য করতে পারছে না।

ডক্টর ক্লবোনি বড় অদ্ভুত লোক। জাহাজের সবার মন যখন ভয়ে আচ্ছন্ন, তিনি তখন মহা ফুর্তিতে প্রকৃতির অপরূপ লীলা উপভোগ করছেন। আকাশে উল্কার ছোটাছুটি, মেরু অঞ্চলে আলোর ভেলকিবাজি, চাঁদের বৈচিত্র্যময় অবস্থান–এসব নিয়েই ডক্টর মত্ত। ৮ ডিসেম্বর হঠাৎ থার্মোমিটারের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলেন তিনি। শূন্য তাপাঙ্কের উনচল্লিশ ডিগ্রি নিচে নেমে জমে গেছে পারদ। বাইরের তাপমাত্রা আরও কম। এই তাপমাত্রায় বেঁচে থাকাই খুব কষ্টসাধ্য কাজ।

সেদিনই আর একটা দুঃসংবাদের মুখোমুখি হতে হল সবাইকে। কয়লার মজুদ শেষ। যেটুকু কয়লা ছিল তাই দিয়ে শেষবারের মত জ্বালানো হয়েছে আগুন।

২০ ডিসেম্বর, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের জীবনের সবচেয়ে সঙ্কটময় দিন। কয়লা শেষ। আগুন নিভে গেছে। নাবিকেরা সবাই ক্যাপ্টেনকে ঘিরে ধরল। শ্যানডন নাবিকদের পক্ষ হয়ে এগিয়ে এসে জানাল কয়লা শেষ।

ক্যাপ্টেন কি উত্তর দেবেন? মুখে কোন কথা নেই তাঁর। এতদিন পর পেন ক্যাপ্টেনের উপর একটু চোটপাট করার সুযোগ পেল। সে চিৎকার করে উঠল, 'কয়লা শেষ তো কি হয়েছে? জাহাজের কাঠ আছে। জাহাজের কাঠ কেটে পোড়াও!'

অন্য নাবিকেরাও পেনের কথায় সায় দিয়ে উঠল। ফ্যাকাসে হয়ে গেল হ্যাটেরাসের মুখ। তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। আচমকা একটা কুঠার তুলে নিয়ে পেনের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। ডক্টর সময় মত ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়ায় এ যাত্রা বেঁচে গেল পেন। কুঠারটা গেঁথে গেল কাঠের পাটাতনে।

নিজেকে সামলে নিলেন ক্যাপ্টেন। ভর্ৎসনা করে পেনের উদ্দেশ্যে বললেন, 'হাঁদারাম! জাহাজ পোড়ালে আমরা দেশে ফিরব কি করে? জাহাজে মজুদ মদ দিয়েই আপাতত আগুন জ্বালাও। এছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

ক্যাপ্টেনের কথায় কাজ হল। নাবিকেরা জাহাজের খোল থেকে মদ এনে আগুন ধরাল।

ক্যাপ্টেন এখন কাউকেই আর বিশ্বাস করছেন না। সবসময় কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে ডেকের ওপর পায়চারি করেন। তাঁকে সঙ্গ দেয় সেই ডেনিস কুকুরটা।

কিছুতেই দিন যেন আর কাটতে চায় না। মদ দিয়ে আগুন জ্বালানো খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হল না। পাঁচদিন যেতে না যেতে বাধ্য হয়েই ডক্টর নিজে এসে হ্যাটেরাসকে বলল, 'ক্যাপ্টেন, কাঠ দিয়েই আগুন জ্বালাতে হবে! তা নাহলে নির্ঘাত মরতে হবে সবাইকে।'

ক্যাপ্টেন অন্তত ডক্টরের কাছ থেকে এধরনের প্রস্তাব আশা করেননি। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'আপনারা যা খুশি করতে পারেন, জাহাজের কাঠ পোড়ানর অনুমতি আমি কক্ষনো দেব না।'

তাঁর অনুমতির অপেক্ষায় থাকল না কেউ, নাবিকেরা কুঠার নিয়ে ছুটল পাটাতন কাটতে। ক্যাপ্টেনের চোখ ছল ছল করে উঠল। কিন্তু বলার কিছু নেই।

নববর্ষের দিন একটা সুসংবাদ নিয়ে ছুটে এলেন ডক্টর ক্লবোনি। হাতে বেলচারের লেখা একটা বই। বেলচার লিখেছেন, এখান থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে মাটির নিচে কয়লা লুকানো আছে। সেটা নিজে দেখেছেন বেলচার।

ডক্টরের কথা শুনেই ক্যাপ্টেন যন্ত্রপাতি নিয়ে মাস্তুলের উপরে উঠে গেলেন। ফিরে এলেন অনেকক্ষণ পরে। কয়লার সন্ধান পাবার উৎফুল্লতা আর নেই। ডক্টরকে আড়ালে ডেকে তিনি বললেন, 'খবরদার, ডক্টর! কাউকে বলবেন না। আমরা আপনাআপনি প্রায় দু-ডিগ্রি আরও ভেসে এসেছি। কয়লা এখান থেকে এখনও তিনশো মাইল দূরে!'

মুখে যাই বলুন না কেন, মনে মনে কিন্তু হ্যাটেরাস আনন্দিত। নিজের অজান্তেই তাঁর জাহাজ সুমেরু বৃত্তের আট ডিগ্রির কাছে চলে এসেছে।

কয়লার স্তূপ তিনশো মাইল দূরে হলে কি হবে! জনসন কয়লা উদ্ধারের যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু করে দিল। প্রায় তিনশো মাইল পথ বরফের উপর দিয়ে যেতে ছয় সপ্তাহ সময় লেগে যাবে। সেভাবেই ৩৫ফুট লম্বা আর ২৪ ফুট চওড়া স্লেজ গাড়ির প্রয়োজনীয় সবকিছু তুলে নিল জনসন। ছয়টি কুকুর জুড়ে দেয়া হয়েছে গাড়িতে আগে। প্রায় দুশো পাউন্ড মালপত্র তোলা হয়েছে। খাবার-দাবার, বন্দুক, বারুদ, স্টোভ কোন কিছুই বাদ পড়েনি।

রওনা হবার আগ মুহূর্তে হ্যাটেরাস চিন্তায় পড়ে গেলেন। যারা তাঁর সঙ্গে যাচ্ছে তারা তো যাচ্ছেই। কিন্তু যারা থাকছে তারা না জানি কি অঘটন ঘটিয়ে বসে! তাই জনসনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'দেখ জনসন, যারা জাহাজে রয়ে গেল তাদের মধ্যে শুধু তোমাকেই আমি বিশ্বাস করি। তুমি জাহাজের দিকে লক্ষ রেখ। তোমাকে অধিকার দিয়ে যাচ্ছি, যদি দরকার পড়ে, জাহাজের কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেবে। যে রকম প্রয়োজন, হুকুম দেবে। আমরা যদি সপ্তাহ ছয়েকের মধ্যে ফিরে না আসি তাহলে জাহাজ নিয়ে তোমরা দেশে ফিরে যেয়ো।'

'আপনি যেভাবে বলছেন সেভাবেই সব হবে, ক্যাপ্টেন। কোন চিন্তা করবেন না।' বাধ্য নাবিকের মত গদগদ কণ্ঠে ক্যাপ্টেনকে আশ্বস্ত করল জনসন।

ডক্টর ক্লবোনি, বেল, সিম্পসন এবং কুকুর ডাককে নিয়ে ৬ জানুয়ারি ক্যাপ্টেন বেরিয়ে পড়লেন কয়লার সন্ধানে। নাবিকদের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে ওদের চোখে-মুখে বিদ্রূপের হাসি দেখলেন তিনি। সেদিকে ভ্রূক্ষেফ না করে সবাইকে নিয়ে উঠে পড়লেন স্লেজ গাড়িতে। ধীরে ধীরে পিছনে মিলিয়ে গেল বরফ ঢাকা ফরওয়ার্ড। স্লেজ এগিয়ে চলেছে দ্রুত গতিতে।

এগারো

প্রথমদিনেই বিশ মাইল পথ পার হলেন ক্যাপ্টেন। সন্ধ্যা নামতেই বরফ দিয়ে ইগলু বানিয়ে রাত যাপনের ব্যবস্থা করা হল। সারাদিনের পথ চলায় সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাতের খাবার খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন ও তাঁর সঙ্গীরা।

শীতের প্রকোপ কমার কোন লক্ষণই যেন নেই। আপাদমস্তক গরম কাপড়ে আবৃত থাকা সত্ত্বেও অভিযাত্রীরা সবাই যেন জমে যাচ্ছে! শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। কথা বললেই ঠোঁটে বরফ জমে যায়। এই অবস্থাতে ১৫ জানুয়ারি একশো মাইল পথ পাড়ি দিল ক্যাপ্টেনরা। আর সেদিনই দুপুরে একদল হিংস্র জন্তুর হামলায় স্লেজের প্রায় সবকিছুই খুইয়ে বসল ওরা।

দুপুরের খাবার খেয়ে হাঁটতে বেরিয়েছিল সবাই। ডক্টরের কড়া নির্দেশ–শীতে জমে যাবার হাত থেকে রক্ষা পেতে চাইলে প্রতিদিন কিছুটা সময় হাঁটাহাঁটি করে শরীরকে চাঙা রাখতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে ছোট একটা বরফ পাহাড়ের কাছে

পৌঁছল ওরা। চারদিকটা ভাল করে দেখে নেয়ার জন্যে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগলেন ক্লবোনি। বেশ খানিকটা উঠে পেছনে ফিরে চাইতেই দুচোখ কপালে উঠল তাঁর। ডক্টরের দেখাদেখি সবাই ঘুরে তাকাল পেছনে। ওরা দেখল– গোটা পঁচিশেক শিয়াল আর পাঁচ-ছ'টা ভালুক স্লেজের সমস্ত খাবার দাবার লুট-পাট করে নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করে জন্তুগুলো তাড়ালেন ক্লবোনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিচে নেমে দৌড়ে গেল ওরা স্লেজের কাছে। কিন্তু যে সময়টুকু পেয়েছিল সেটাই যথেষ্ট। মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট, তাতেই ২০০পাউন্ড মাংস, ১৫০ পাউন্ড বিস্কুট, এক পিপে মদ আর অনেক চা পাতা নষ্ট করে ফেলেছে হিংস্র জানোয়ারের দল। উপোসী জন্তুদের কাছ থেকে এরকম আচরণ অস্বাভাবিক কিছু নয়। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। ক্ষতির কথা ভেবে আর সময় নষ্ট করতে চান না ক্যাপ্টেন। এখন থেকে খাবার-দাবার বুঝে সমঝে খেতে হবে। সবাইকেই বরাদ্দের অর্ধেক খেতে হবে। তা না হলে যে খাবার রয়েছে তাতে অভিযান শেষ করে জাহাজে ফেরা সম্ভব নয়। আবার এগিয়ে চললেন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস। কোন কিছুতেই দমবার পাত্র তিনি নন। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তবুও তিনি এগিয়ে যাবেনই।

এদিকে সিম্পসনের শরীর প্রতি মুহূর্তেই আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। শরীর মন দুই-ই ভেঙে পড়েছে তার। শরীরের এ অবস্থা নিয়েও ফিরে যেতে চেয়েছিল সে। কিন্তু কাউকে সাথী না পাওয়ায় অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে চলল হ্যাটেরাসের সঙ্গে।

১৮ জানুয়ারি। বরফ প্রান্তর রূপ বদলাতে শুরু করেছে। পিচ্ছিল সমতল প্রান্তর হয়ে উঠল এবড়োখেবড়ো খাঁজকাটা। সারাদিন পথ চলে ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন ও তাঁর সঙ্গীরা। কিন্তু পথ পার হল মাত্র পাঁচ মাইল। ক্লান্তি আর অবসাদে ওরা এতই কাবু হয়ে পড়েছে যে ইগলু বানানর শক্তি পর্যন্ত কারও নেই। এদিকে তাপমাত্রা আবারও শূন্য তাপাঙ্কের উনচল্লিশ ডিগ্রি নিচে নেমে এসেছে। কোনমতে মোষের চামড়ার তাঁবু খাটিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা।

২০ জানুয়ারি। আবহাওয়া মোটেই ভাল যাচ্ছে না। হঠাৎ ধাক্কা লেগে স্লেজ গাড়ির সামনেটা ভেঙে গেল। গাড়ি ঠিক করতে লেগে গেল অনেকটা সময়। এদিকে সিম্পসনের অবস্থা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন ডক্টর। স্কার্ভিতে ভুগছে সে। শুধু হাত-পা নয় মাড়িও ফুলে উঠেছে। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওর। ডক্টর তাই হ্যাটেরাসকে বললেন, 'ক্যাপ্টেন, সিম্পসনের যা অবস্থা তাতে ওকে আর হাঁটিয়ে নেয়া যাবে না। গাড়িতে শুইয়ে নিতে হবে। আমার মনে হয় দিন দুয়েক বিশ্রাম নিলে ওর জন্যে ভাল হয়।'

'বিশ্রাম!' অবাক হলেন ক্যাপ্টেন। 'কয়লার উপর নির্ভর করছে জাহাজের সবার জীবন। একজনের জন্যে বিশ্রাম নেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়!'

ক্যাপ্টেনের কথার অবাধ্য হবার সাহস আর কারও নেই। সারারাত সিম্পসনের সেবা করলেন ডক্টর। পরদিন রওনা হবার আগে সিম্পসন বার বার অনুরোধ করল তাকে রেখে যেতে। 'আমাকে এখানেই রেখে যান। অন্তত শান্তিতে মরতে দিন।' ধরা গলায় বলল সে।

ডক্টর সিম্পসনের ছেলেমানুষি কথায় কান দিলেন না। স্লেজ গাড়িতে তোলা হল তাকে। ঠিক তখনি আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। এমন সময় ডাক হঠাৎ চেঁচাতে চেঁচাতে কোথায় যেন গিয়ে আবার ফিরে এল। ডাক বারবারই ওই একটা দিকেই ছুটে যেতে লাগল। অর্থাৎ, অভিযাত্রীরা যেন ওকে অনুসরণ করে। ডক্টর আর বেল ওর পিছু নিল। পেছনে পেছনে গিয়ে ওরা হাজির হল একটা চুনাপাথরের তৈরি বরফ ঢাকা স্তূপের সামনে।

ক্লবোনি আর বেল উত্তেজনার বশে এক মুহূর্ত দেরি না করে গাঁইতি দিয়ে ভেঙে ফেলল সেই স্তূপ। গর্তের ভেতরে পাওয়া গেল একটা ভেজা স্যাঁতসেঁতে কাগজ। তাতে লেখা রয়েছে মাত্র দুলাইন, অনেকটা সাঙ্কেতিক ভাষার মত করে লেখা: 'আলটাম…পরপয়েজ…১৩ ডিসেম্বর…১৮৬০…১২ ডিগ্রি….লঙ্গি…৮…৩৫ মিনিট ল্যাটি…।' কাগজটা হাতে করে ফিরে গেল ওরা ক্যাপ্টেনের কাছে। কাগজটায় একবার চোখ বুলাতেই ভুরু কুঁচকে উঠল ক্যাপ্টেনের। পরপয়েজ নামের কোন জাহাজের কথা ক্যাপ্টেন জানেন না।

ক্লবোনি বললেন, 'ক্যাপ্টেন পরপয়েজের নাম আপনার কাছে অজানা থাকলেও এ জাহাজের নাবিকরা যে কিছুদিনের মধ্যে এই পথ দিয়েই গেছে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।'

বারো

অশান্তি, অসন্তোষ চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে অভিযাত্রীদের। সিম্পসনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। বাঁচার কোন আশাই নেই। ডক্টরকে চোখের সেই ছোঁয়াচে রোগে পেয়ে বসেছে। চোখের যন্ত্রণায় রীতিমত কাহিল অবস্থা তার। বেশি অনিয়ম হলে অন্ধ হয়ে যাবার ভয় আছে। চলার পথ এখন আরও দুর্গম। মাঝে মাঝে স্লেজ ঘাড়ে করে অনেক উঁচু পাহাড়ে উঠতে হচ্ছে। তার ওপর তুষার ঝড় তো আছেই। তবু ক্যাপ্টেন নির্ভীকভাবে এগিয়েই চলেছেন।

২৫ জানুয়ারি মস্ত এক বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেলেন ক্যাপ্টেন ও তাঁর সঙ্গীরা। সেদিন বেশ ঝড় বইছিল। রাতে ইগলুর ভেতর ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ডক্টর উঠে বসতে গেলেন কিন্তু মাথা ঠুকে গেল ইগলুর ছাদে। সময়মত টের পেয়েছিলেন বলে সবাইকে ঝটপট ইগলুর বাইরে বের করে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। ডক্টর জেগে না উঠলে ইগলুর ছাদ ধসে গিয়ে সবারই জীবন্ত সমাধী হয়ে যেত।

পরদিন পথে একটি আমেরিকান বন্দুক কুড়িয়ে পেল বেল। সম্ভবত ওটা পরপয়েজের নাবিকদের কারও ছিল। এ ছাড়াও পাওয়া গেল একটা সেক্সট্যান্ট আর একটা ফ্ল্যাস্ক। এসব দেখে সবাই ভাবল পরপয়েজের নাবিকদের সঙ্গে শিগ্‌গিরই হয়তো দেখা হবে ওদের। হ্যাটেরাস কিন্তু মোটেও খুশি নন। পরপয়েজের অসহায় নাবিকদের এড়িয়ে যেতে পারলেই যেন বেঁচে যান তিনি।

২৭ জানুয়ারি ফরওয়ার্ডের অভিযাত্রীদের জন্যে সবচেয়ে বেদনার দিন। সন্ধ্যার দিকে সিম্পসনের অন্তিম সময় ঘনিয়ে এল। এদিকে তুষারের ঝাপ্টা ও ঝড়ের বেগও বাড়ছে। তিন তিনবার চেষ্টা করেও ওরা তাঁবু খাটাতে পারল না। তুষার-কণা সুচের মত এসে বিঁধছে ওদের চোখে-মুখে। মৃত্যু পথের যাত্রী সিম্পসন খোলা আকাশের নিচে শুয়ে শেষ মুহূর্তের অপেক্ষা করছে। দাঁতে দাঁত লেগে ঠক ঠক আওয়াজ হচ্ছে। দেহে প্রাণের স্পন্দন কমে আসছে, তবুও জ্বলন্ত চোখে সে চেয়ে আছে হ্যাটেরাসের দিকে। শেষ মুহূর্তে দেহের সর্বশক্তি দিয়ে শেষবারের মত উঠে বসল সিম্পসন। নিঃশব্দে ক্যাপ্টেনের দিকে আঙুল উঁচিয়ে তার এ পরিণতির জন্যে দায়ী করল ক্যাপ্টেনকে। তারপরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল সে। অসম্ভবকে জয় করার অভিযানে প্রথম মৃত্যু। ফরওয়ার্ডের ১৭ জন অভিযাত্রীর অভিযানের প্রথম আত্মদান।

এই প্রথম ক্যাপ্টেনের আর এক রূপ দেখার সৌভাগ্য হল ওদের। পলকহীন দৃষ্টিতে সিম্পসনের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপ্টেন তাঁর গাল বেয়ে নেমে এল ছোট্ট এক ফোঁটা অশ্রু। মাঝপথে জমে বরফ হয়ে গেল সেটা। সারারাত একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। তাঁর এই মূর্তি অবাক করল ডক্টর আর বেলকে।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের দাপাদাপি অনেকটা কমে এল। বেশ কদিন পর সকালে সূর্যের মুখ দেখা গেল। আকাশে সূর্য উঠলেও হ্যাটেরাসের মনের আকাশ তখন কালো মেঘে ঢাকা। ভারাক্রান্ত কণ্ঠে ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন, 'ডক্টর, বেল, যে জায়গায় কয়লা আছে বলে বেলচার উল্লেখ করেছেন তা এখান থেকে আরও প্রায় ষাট মাইল দূরে। আমাদের এখন যা অবস্থা, তাতে সামনের দিকে এগোলে মৃত্যু অবধারিত। তারচেয়ে বোধহয় ফিরে যাওয়াই ভাল।'

'বেশ। তাহলে ফিরেই যাওয়া যাক।' ক্যাপ্টেনের কথায় সানন্দে রাজি হলেন ডক্টর। বেলও একমত।

'তাহলে যাত্রা শুরুর আগে দুএকটা দিন বিশ্রাম নিলে মন্দ হয় না, কি বলেন?' আবারও নরম গলায় বললেন ক্যাপ্টেন। এতেও কারও অমত নেই।

বিশ্রামের দুদিন স্লেজ মেরামত, পোশাক সেলাই ইত্যাদি কাজ সারল ওরা। ডাককে এবার জুড়ে দেয়া হবে গাড়ির সঙ্গে। দুটো কুকুর পথে মারা গিয়েছিল। ডাক ওদের বদলে টানবে স্লেজ। তাছাড়া এখন মালপত্রের ওজনও অনেক কম। মাত্র দুশো পাউন্ডে এসে ঠেকেছে।

৩০ জানুয়ারি। সকাল থেকেই ডক্টর লক্ষ করলেন উত্তেজিতভাবে ডাক একটা স্তূপের সামনে গিয়ে বারবার ঘেউ ঘেউ করছে, তারপর আবার ফিরে আসছে। ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে সে। হয়ত সিম্পসনের কথা এখনও ভুলতে পারছে না সে। মানুষের প্রতি কুকুরের প্রেম কারও অজানা নয়। হঠাৎ কি জানি কেন, ডক্টরের ইচ্ছে হল—ডাক যে বরফ স্তূপের সামনে বারবার গিয়ে ফিরে আসছিল সিম্পসনের মৃতদেহ তিনি সেখানেই গর্ত করে কবর দেবেন বলে ঠিক করলেন। বেলসহ বরফ স্তূপের কাছে গিয়ে আলগা তুষার সরিয়ে গাঁইতি দিয়ে শক্ত বরফ কাটতে শুরু করলেন

তিনি। ডক্টর গাঁইতি দিয়ে জোরে এক ঘা মারতেই ঠং করে একটা বোতল গুঁড়িয়ে গেল। চমকে উঠল সবাই। এখানে বোতল এল কিভাবে? বেল ততক্ষণে গাঁইতির আঘাতে তুলে এনেছে একটা ব্যাগ। ব্যাগের ভিতর কিছু বিস্কুটের গুঁড়ো। খুশি হয়ে উঠল ওরা সবাই। তাহলে কি খাবারের কোন গোপন ভাণ্ডার মিলল? দ্বিগুণ উদ্যমে ডক্টর ও বেল গাঁইতি চালাতে লাগল। একটি বরফের চাঁই ভেঙে সরে যেতেই চেঁচিয়ে উঠল বেল। দুটো পা! মানুষের দুটো পা দেখা যাচ্ছে!'

বরফের নিচ থেকে বের করা হল লাশটি। মরে কাঠ হয়ে আছে। বয়স বছর তিরিশেক হবে। খুঁড়তে খুঁড়তে বয়স্ক লোকের আর একটি মৃতদেহ পাওয়া গেল। একই অবস্থা। মেরু অভিযাত্রীর পোশাক দুজনেরই গায়ে। আরও একজনকে টেনে আনল ওরা। কি মনে করে দেহটিকে খুব ভাল করে পরীক্ষা করলেন ডক্টর। তারপর বেলের দিকে ফিরে বললেন, 'নাড়ির স্পন্দন প্রায় নেই বললেই চলে; তবুও চেষ্টা করতে দোষ কি? জলদি একে স্লেজে নিয়ে চল।'

লোকটার বয়স চল্লিশের কোঠায়। পকেটে কি আছে দেখতে গিয়ে একটা আধপোড়া খাম বের হল। খামে অনেকটা সাঙ্কেতিক অক্ষরের মত করে লেখা– টামন্ট…পয়েজ …ইয়র্ক। অবশ্য পুড়ে যাওয়ায় এমনটি হয়েছে।

জ্ঞানের আধার ডক্টর ক্লবোনির বেশি সময় লাগল না পোড়া খামের বাকি লেখা মিলিয়ে ফেলতে। কি হতে পারে বের করার আনন্দে চিৎকার করে তিনি সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন। ওটা হবে আলটামন্ট–পরপয়েজ–নিউ ইয়র্ক। অর্থাৎ নিউ ইয়র্ক পরপয়েজ জাহাজের আলটামন্ট।

ক্লবোনির উল্লাসে ক্যাপ্টেন কিছুতেই খুশি হতে পারলেন না। তিনি দাঁত চেপে এমনভাবে 'আমেরিকান!' কথাটা উচ্চারণ করলেন যে কারও বুঝতে বাকি রইল না হ্যাটেরাস কি বোঝাতে চান। ক্যাপ্টেন কোন উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চান না। সবচেয়ে বড় কথা, কোন আমেরিকান ওদের সঙ্গী হবে এটা যেন তাঁর সহ্যের বাইরে। তবুও ডক্টর বললেন, আমেরিকান হলেও কোন মৃত্যু পথযাত্রীকে অসহায় ফেলে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি আলটামন্টকে বাঁচিয়ে তুলতে চান।

সিম্পসনকে বরফ খুঁড়ে সমাহিত করার পর আলটামন্টকে স্লেজে শুইয়ে দেয়া হল। এবার শুরু হল ফিরতি যাত্রা।

অবর্ণনীয় পথশ্রম পদে পদে নানারকম বিপদের মাঝেই কেটে গেল আরও কটি দিন। অভিযাত্রীরা ফরওয়ার্ডের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি ক্যাপ্টেন একটি দৃশ্য দেখে হতচকিত হয়ে পড়লেন। ফরওয়ার্ড যেদিকে, সেদিকের আকাশে কালো ধোঁয়া! ক্যাপ্টেন পাগলের মত চিৎকার করে উঠলেন, নিশ্চয়ই শয়তান, বিশ্বাসঘাতক নাবিকেরা ফরওয়ার্ডকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। ঘণ্টাখানেক অতি দ্রুত বেগে দৌড়ে এসে ওরা থামল জ্বলন্ত ফরওয়ার্ডের কাছে। দেখল, জনসন ক্ষোভে পাগলের মত হাত পা ছুঁড়ছে। পরক্ষণেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে জাহাজের বারুদ ঘর উড়ে গেল। চৌচির হল বরফ প্রান্তর। এ দৃশ্য দেখে ক্যাপ্টেন যেন বোবা হয়ে গেলেন। অসহায় দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন আগুনের লেলিহান শিখার দিকে। দেখলেন, তাঁর সাধের ফরওয়ার্ড কিভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে!

*

একদিন নয়, দুদিন নয়, নয়-নয়টি মাস অবর্ণনীয় কষ্ট, পথশ্রমের পর আজ এ কি হল! এই পরিণাম হবে তা কি কেউ ভাবতে পেরেছিল? স্থাণুর মত দাঁড়িয়েই থাকলেন ক্যাপ্টেন। তিনি চেয়েছিলেন বরফ রাজ্যে অনাবিষ্কৃত সমুদ্র আবিষ্কার করে বিশ্ববাসীকে অবাক করে দেবেন। ফরওয়ার্ডের অভিযাত্রীরা বিজয়ের গর্বে বুক চিতিয়ে হাঁটবে দেশের মাটিতে। কিন্তু হায়! সব আশাই বুঝি শেষ হয়ে গেল।

তেরো

বিশাল বরফ প্রান্তর। হাড় কাঁপানো শীত। জ্বলন্ত ফরওয়ার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন, ডক্টর ক্লবোনি, বেল আর জনসন। সতেরোজনের একজন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। বারোজন বিশ্বাসঘাতকতা করে নৌকা নিয়ে পালিয়েছে। আর অসহায় ওরা চারজন রয়ে গেছে বরফ রাজ্যে। সহায়-সম্বলহীন। না আছে রসদ, না জ্বালানি কিংবা আশ্রয়! ফিরে যাবার জন্যে জাহাজ তো দূরের কথা, একটা নৌকাও নেই। দেশে ফিরতে চাইলে এখনও পাড়ি দিতে হবে কম করে হলেও আড়াই হাজার মাইল!

বিস্ফোরণে জাহাজের সবকিছু চারদিকে বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। কামানটা পড়েছে কিছুদূরে একটা হিমশিলার ওপর। চারদিকে শুধু লোহালক্কড়, দুমড়ানো মুচড়ানো যন্ত্রপাতি, কাঠের টুকরো এসব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। এখানে-সেখানে এখনও আগুন জ্বলছে। বরফ গলে গিয়ে আবার জমতে শুরু করেছে।

জনসন আপ্রাণ চেষ্টা করেছে ফরওয়ার্ডকে বাঁচাতে। কিন্তু শ্যানডন ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে একা পেরে ওঠেনি। তাই গুম হয়ে আছে সে। একথা সেকথার পর জনসন হঠাৎ লক্ষ করল সিম্পসন ওদের সঙ্গে নেই। সিম্পসনের অসহায় মৃত্যুর কথা শুনে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল জনসনের মন। তারপর যখন শুনতে পেল কয়লা আনা হয়নি তখন রীতিমত হতাশ হয়ে পড়ল সে। চুপচাপ অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর জনসন বলল, 'যা হবার তা তো হবেই। শুধু শুধু দুশ্চিন্তা না করে দেখা যাক ধ্বংসস্তূপ থেকে কিছু উদ্ধার করা যায় কিনা।' ডক্টর ও জনসন দুজন দুদিকে বের হল কি পাওয়া যায় খুঁজে দেখতে। ক্যাপ্টেন ভগ্নহৃদয়ে নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন কয়লা হয়ে যাওয়া ফরওয়ার্ডের সামনে।

ডক্টরকে ডেকে স্লেজ গাড়িটা নিয়ে আসতে বলল জনসন। স্লেজে মৃতের মত শুয়ে আছেন আলটামন্ট। এদিকে বেল নিদারুণ হতাশায় বরফের উপরই শুয়ে পড়েছিল। জনসন বকে-ঝকে সান্ত্বনা দিয়ে তাকে বোঝাল, হতাশ হয়ে পড়লে চলবে না। মনোবল শক্ত রেখে কাজ করে যেতে হবে।

বেলকে নিয়ে জনসন একটা ইগলু বানিয়ে ফেলল। ডক্টর একটা স্টোভ মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় পেয়েছিলেন, সেটায় আগুন জ্বালানো হল। আবার কিছুটা

উদ্যম ফিরে এল ওদের মাঝে।

খাবারের পালা চুকিয়ে ডক্টর আর জনসন বের হল ধ্বংসস্তূপে আর কি পাওয়া যায় খুঁজে বের করতে। চাঁদের আলো থাকাতে সবকিছু খুঁজে ফিরতে ওদের বেশ সুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু তেমন কিছুই পাওয়া গেল না। কিছু শুকনো মাংস, চারটা বোতলে কিছু ব্র্যান্ডি, কয়েক ব্যাগ বিস্কুট, চকোলেট, কফি এসব ছাড়া আর তেমন কিছুই উদ্ধার করা গেল না।

আলটামন্টের শারীরিক অবস্থায় এখনও তেমন কোন উন্নতি হয়নি। স্কার্ভিতে ভুগে বেচারার অবস্থা রীতিমত কাহিল। এখনও মড়ার মত পড়ে আছেন তিনি। অন্যেরাও মানসিক দিক দিয়ে আলটামন্টের মতই নিস্তেজ।

জনসন জানাল, শ্যানডনরা কিভাবে মদে চুর হয়ে নৌকা নিয়ে পালিয়েছে। আর পেন ক্যাপ্টেনের উপর প্রতিশোধ নিয়েছে জাহাজে আগুন লাগিয়ে। বারবার এত আপদ-বিপদ সয়ে সহ্যশক্তি বেড়ে গিয়েছিল সবার, তাই জনসনের কথা শুনে ওদের আর তেমন কোন প্রতিক্রিয়া হল না।

এত ঝড়-ঝাপটার পর আর উত্তরে যাবার সখ কারও থাকার কথা নয়। ডক্টর তাই পশ্চিমে ফিরে যাবার প্রস্তাব দিলেন। যে যাই বলুক না কেন ক্যাপ্টেন কিন্তু উত্তর মেরু যাবার জন্যে এখনও একপায়ে খাড়া। তাই তিনি কৌশলে ডক্টরের মত পরিবর্তনের জন্যে বললেন, পশ্চিমের পথ তো তাদের সবার কাছেই অজানা!

ডক্টর বুঝে গেছেন ক্যাপ্টেন কি বলতে চান। তাই কিছুটা রাগতঃস্বরে তিনি বলে উঠলেন, 'পথ জানা বা অজানা যাই হোক না কেন আমরা পশ্চিমেই যাব। ইংল্যান্ড উত্তরে নয় পশ্চিমে!'

বেল আর জনসনকে তাঁর দলে আনতে চেষ্টা করলেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু ওরা ডক্টরের পক্ষে রইল।

ডক্টর ওদের উৎসাহ দিয়ে বললেন, যদিও পশ্চিমে যেতে প্রায় দুশো মাইল পথ পার হতে হবে। তবুও স্লেজে করে গেলে বেশি দিন লাগবে না। মার্চ মাসের শেষ নাগাদ সমুদ্রের ধারে পৌঁছে যাওয়া যাবে। প্রতিদিন গড়ে কুড়ি মাইল করে হাঁটলেই চলবে। তেমন কষ্টও হবে না।

ডক্টরকে যখন তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে টলানো যাবেই না তখন ক্যাপ্টেন তাঁকে শুধু আর একটা দিন অপেক্ষা করে যেতে বললেন। ডক্টর, বেল অথবা জনসন কেউই ক্যাপ্টেনের প্রস্তাবে রাজি হল না। তখন ক্যাপ্টেন মিনতি জানিয়ে সবার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমি জানি, উত্তরে বাঁচার পথ আছে বললে কেউ সে কথা শুনবে না। কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর, উত্তরেই আছে স্মিথ প্রণালী, খোলা সমুদ্র। একবার যেতে পারলেই হয়। শীত তো প্রায় কমে আসছে। আর কিছুটা কমলেই আমাদের আর কোন অসুবিধা হবে না।'

ক্যাপ্টেনের মিনতি ওদের মোটেও বিচলিত করল না। জনসন আবেগে কাজ করে না। ঠাণ্ডা গলায় সে বেলকে বলল, 'চল স্লেজের সবকিছু ঠিকঠাক করে নেই।'

'তুমিও! জনসন, তুমিও আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছ?' ক্যাপ্টেন একদম ভেঙে পড়লেন।

এবার বিপাকে পড়ে গেল জনসন। কি করা যায়? এতদিনই যখন ক্যাপ্টেনের নির্দেশ ওরা সবাই মেনেছে। আজ ক্যাপ্টেনের অনুরোধে একটা দিন থেকে গেলে কি এমন এসে যায়? জনসন তাকাল বেল আর ডক্টরের দিকে। দেখল, ওদের চোখেমুখেও সম্মতির ভাব উঠেছে।

এদিকে একই সময়ে আলটামন্ট শোয়া থেকে উঠে এসে হাঁটু গেড়ে বসেছেন, এখনও তার শরীর খুবই দুর্বল। জনসনের হাত ধরে নাড়া দিলেন তিনি। তুষারের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ঠোঁটে কিছু বললেন জনসনকে। বিকৃত স্বর শোনা গেল, এক বর্ণও বোঝা গেল না।

অনেক কষ্টে শুধু একটা কথা বোঝা গেল—'পরপয়েজ।'

'পরপয়েজ!'—অবাক ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস।

'কোথায় আছে? এখানে?' আবারও প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন। আলটামন্ট ঘাড় কাত করে জানালেন এখানেই আছে পরপয়েজ।

এবার ক্যাপ্টেন একের পর এক প্রশ্ন করলেন আর আলটামন্ট ঘাড় কাত করে হ্যাঁ-না বলে দিলেন। এভাবেই বেশ সময় নিয়ে ক্যাপ্টেন পরপয়েজের অবস্থান বের করে ফেললেন। পরপয়েজ জাহাজ পড়ে আছে একশো বিশ ডিগ্রি পনেরো মিনিট লঙ্গিচিউড এবং তিরাশি ডিগ্রি পঁয়ত্রিশ মিনিট ল্যাটিচিউডে।

অন্যেরা সবাই পরপয়েজের সন্ধান জেনে আনন্দিত হলেও ক্যাপ্টেন অত্যন্ত নাখোশ হলেন। কেননা পরপয়েজ যে তার চাইতেও তিন ডিগ্রি বেশি উত্তরে এগিয়ে গেছে! এ যে তাঁরই ব্যর্থতা!

চোদ্দ

আবার নতুন করে যাত্রা শুরু হল। এবারের পথ প্রায় চারশো মাইল। সময় লাগবে দুসপ্তাহের কিছু বেশি। লক্ষ্যস্থল পরপয়েজ জাহাজ। আলটামন্টের কাছ থেকে জানা গেছে, জাহাজে খাবারের কোন অভাব নেই। নেই কয়লার অভাব। রসদপত্র যা প্রয়োজন সবই আছে। একবার কোনমতে পরপয়েজে পৌঁছতে পারলেই হল। শীতটা আরামে কাটিয়ে বরফ গলা শুরু হলে দেশে ফিরে যাওয়া যাবে। পরপয়েজ তিন মাস্তুলের জাহাজ। পাহাড়ের গায়ে কাত হয়ে পড়লেও জাহাজের তেমন ক্ষতি হয়নি। সামান্য মেরামত করেই সমুদ্রে নামানো যাবে।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে আলটামন্ট আরও জানালেন বরফ প্রান্তরে বন্দী অবস্থায় ভেসে গিয়ে পাহাড়ে ঠেকেছে পরপয়েজ। দুমাস আগে পরপয়েজে করে স্মিথ প্রণালীর দিকে রওনা হয়েছিলেন আলটামন্ট। পথে সঙ্গী-সাথীরা সবাই মারা গেলেও তিনি বেঁচে গেলেন ফরওয়ার্ডের অভিযাত্রীদের সহায়তায়।

হ্যাটেরাস আবার জানতে চাইলেন, 'তিরিশ ডিগ্রিতে খোলা সমুদ্র দেখতে পেয়েছিলেন কি?'

আলটামন্ট জানালেন, 'না।'

বরফ সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে ওরা। জনসন একটা কথা ভেবে ভয় পাচ্ছিল, শেষমেষ কথাটা বলেই ফেলল সে, 'খোলা সমুদ্রের উপর বরফ তো জমে আছে ঠিকই। কিন্তু কখন যে পায়ের তলার বরফ সরে গিয়ে সোজা সমুদ্রের পানিতে পড়তে হয়, সেটাই ভয়!'

জনসনের কথা শুনে ডক্টর হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, 'তোমার অত ঘাবড়াবার কিছুই নেই। এসমস্ত অঞ্চলে বরফ প্রায় তিরিশ-চল্লিশ ফুট পুরু হয়। তাছাড়া এটা বোধহয় জান না যে দু-ইঞ্চি পুরু বরফ অনায়াসে একজন মানুষের ভার সইতে পারে। ঘোড়াসহ ঘোড়সওয়ারের ভার বইতে সাড়ে তিন ইঞ্চি বরফই যথেষ্ট। একটা সেনা-ডিভিশন নির্বিঘ্নে দশ ইঞ্চি পুরু বরফের ওপর দিয়ে মার্চ করে যেতে পারে।'

জনসন এবার আশ্বস্ত হল। হঠাৎ বরফস্তর ভেঙে গিয়ে পা পিছলে সমুদ্রে তলিয়ে যাবার কোন ভয় নেই!

পথ আর শেষ হয় না। ইতিমধ্যে কেটে গেছে আরও ষোলোটি দিন। আজ ১৪ মার্চ। কিন্তু এখনও পরপয়েজে যেতে প্রায় একশো মাইল পথ বাকি। খাবার-দাবার যা কিছু ছিল সবই প্রায় শেষ হয়ে গেছে। অভিযাত্রীদের চলার শক্তি নেই বললেই চলে। জীবজন্তু শিকার করার মত গুলিগোলাও নেই। মাত্র ছয়টা কার্তুজ আছে। গোটাকয়েক শিয়াল আর খরগোস এদিক-সেদিক দেখা গেলেও সেগুলো মারা সম্ভব হল না। ডক্টর ছোট একটা সীল মাছ পেয়ে সেটাকেই গুলি করে মারলেন। কিন্তু একটা সীলের মাংসে কি আর পাঁচজনের পেট ভরে! শেষ পর্যন্ত পেটে ক্ষুধা নিয়েই আবারও ওরা পথ চলতে লাগল।

ক্ষুধার্ত শরীরে সারাদিন পথ চলতে গিয়ে ক্লান্তিতে ওদের শরীর ভেঙে পড়তে চায়। সন্ধ্যা নেমে আসতেই ইগলু বানিয়ে স্টোভ জ্বালিয়ে শুয়ে পড়ল সবাই। রাতে আর খাবার খেল না কেউ। কেননা এখনও যেটুকু খাবার অবশিষ্ট আছে তা আধপেটা খেলেও ওদের দুদিনের বেশি চলবে না।

পরদিন ওদের পথ চলার গতি আরও কমে এল। শরীরে নেই শক্তি। পেটে ক্ষুধা! হেঁটে চলার শক্তি পাবে কোত্থেকে? ডক্টর কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন শিয়াল মারার। অনর্থক আরও কয়েকটি কার্তুজ নষ্ট হল। গুলির আওয়াজে অন্যেরা ভেবেছিল, ডক্টর বোধহয় কোন কিছু মেরে আনলেন। কিন্তু তাঁকে খালি হাতে ফিরে আসতে দেখে হতাশায় ওদের চোখ-মুখ আরও কালো হয়ে গেল।

রোববার রাতে অবশিষ্ট খাবারটুকুও শেষ হল। সবাই ভাবছে, এখন কি করা যায়! এমন সময় জনসন দেখল, দূরে স্লেজ গাড়ির কাছে একটা ভালুক খাবার আছে কিনা শুঁকে দেখছে। আর যায় কোথায়! শিকার হাতের কাছে। জনসন ছুটে গিয়ে ডক্টরের কাছ থেকে বন্দুক নিয়ে দৌড়াল ভালুকটাকে মারতে। কাছাকাছি এসে গুলি করতে গিয়ে দেখল, নিশানা করতে পারছে না। হাত কাঁপছে। হাতের দস্তানার জন্যেও অসুবিধা হচ্ছে। পরিণাম কি হতে পারে না ভেবেই চট করে হাত থেকে দস্তানা খুলে ফেলে ভালুকটাকে গুলি করতে গেল সে। দস্তানা খুলতেই হাড় কাঁপানো

শীতে চিৎকার করে উঠল জনসন! বন্দুকটি বরফের ওপর ছিটকে পড়ে শেষ গুলিটিও খামোকা নষ্ট হল। শীতের এতই প্রকোপ যে মুহূর্তের মধ্যে আঙুল জমে ট্রিগারে আটকে গিয়েছিল। জনসনের চিৎকারে ছুটে এলেন ডক্টর। ওকে ইগলুর ভেতরে নিয়ে অল্প গরম জলে ওর আঙুল চোবালেন। তারপর মালিশ করে; ঘষে, সুস্থ করে তুললেন জনসনকে।

সুস্থ হয়ে উঠতেই অনুশোচনায় ভেঙে পড়ল জনসন। বারবার শুধু একই কথা বলতে লাগল সে—তার নির্বুদ্ধিতার জন্যেই শেষ বুলেটটিও খরচ হয়ে গেল। এখন চলবে কি করে?

ওদের ভরসা ডক্টর ক্লবোনি। যাই হোক না কেন একটা কিছু উপায় তিনি বের করবেনই। পরদিন ওদের চলার গতি শম্বুক গতিকেও হার মানাল। সারাদিনে ওরা পথ পেরোল মাত্র তিন মাইল! পেটে একফোঁটা খাবার পড়েনি। কুকুরগুলোরও একই অবস্থা! খিদের জ্বালায় নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করছে। এই সমস্ত অঞ্চলের লোকেরা শরীর সুস্থ রাখার জন্যে সারাদিন ভরপেট খায় আর ওরা আজ প্রায় দেড়দিন কিছুই খেতে পায়নি। এর আগেও আধপেটা খেয়ে কাটিয়েছে। তাই চলার শক্তি বলতে আর কিছুই ওদের অবশিষ্ট নেই। কিন্তু ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস এখনও নিরাশ হয়ে পড়েননি। এরকম শারীরিক ও মানসিক অবস্থাতেও তিনি রাত ফুরোতেই আবার যাত্রা শুরু করলেন। এবার আর হ্যাটেরাস নির্দয় হতে পারলেন না। দুই ঘণ্টা চলার পর তিনি দেখলেন কেউই আর পা ফেলে এগোতে পারছে না। অগত্য তিনি জনসনকে নিয়ে ইগলু বানালেন। খাবার না হয় না-ই পাওয়া গেল। অন্তত শান্তিতে একটু বিশ্রাম অবশ্যই প্রয়োজন। সারাদিন ওরা মড়ার মত শুয়ে থাকল। কে ঘুমাচ্ছে আর কে জেগে আছে তা কিছুই বোঝা গেল না।

রাতের বেলা হঠাৎ জনসন ভয়ে চিৎকার করে উঠল। দুঃস্বপ্ন দেখে ওর ঘুম ভেঙে গেছে। একটা ভালুক ওকে তাড়া করেছিল; আর একটু হলেই ধরে ফেলত আর কি! জনসন বলল গত দুদিন ধরেই ও লক্ষ্য করছে একটা ভালুক ওদের পিছু নিয়েছে। সারাক্ষণ ভালুকের কথা ওর মাথায় থাকলেও এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলেনি সে।

জনসনের কাছে ভালুকের কথা শুনে ডক্টর তো আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। তিনি ভাবলেন—যাক, সাময়িকভাবে কিছু খাবারের জোগাড় হয়ত হল।

ডক্টরের মনোভাবের কথা জানতে পেরে অন্যেরা তো অবাক! বুলেট নেই ভালুক মারবেন কি করে!

ডক্টর ওদের আশ্বস্ত করলেন, 'বুলেট নেই তো কি হয়েছে? বানিয়ে নেব। থার্মোমিটারের পারা দিয়ে গুলি বানাব।'

ডক্টর ওদেরকে আর কোন প্রশ্ন করতে না দিয়ে ইগলুর বাইরে এসে থার্মোমিটারটা বরফের ওপর রাখলেন। অভিজ্ঞ ক্লবোনি বুঝতে পারলেন, বাইরের তাপমাত্রা শূন্য তাপাঙ্কের প্রায় পঞ্চাশ ডিগ্রি নিচে। সুতরাং থার্মোমিটার বাইরে রাখতে না রাখতেই সেটার পারা শূন্য তাপাঙ্কের উনচল্লিশ ডিগ্রিতে এসে জমে শক্ত হয়ে গেল। ডক্টর খুব সাবধানে থার্মোমিটারের কাঁচ ভেঙে জমাট পারদটুকু বের করে নিলেন। তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাল সকালে এটা দিয়েই মারব

ওই ভালুকটা।'

ডক্টরের কথায় সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকাল তাঁর দিকে। কি সব অবিশ্বাস্য কথা বলছেন ডক্টর! মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল না তো?

এদিকে ডক্টর বলেই চলেছেন, 'এই পারদটুকুই আমাদের জীবন বাঁচিয়ে দেবে। তোমরা জান, জেমস রস জমাট পারার বুলেট দিয়ে কাঠ ফুটো করেছিলেন। এমনকি বাদাম তেলের জমাট বুলেট দিয়েও রস কাঠ ফুটো করেছিলেন···।'

ডক্টর আরও কিছু বলতে চাইছিলেন কিন্তু ক্যাপ্টেন ইগলু থেকে বের হয়ে জানতে চাইলেন, ডক্টরের মতলবটা কি! সব শুনে ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমি ভালুক মারব। আমাকেই পারদটা দিন।'

ক্যাপ্টেন আবারও বললেন, 'এই ভালুক মারার উপরই নির্ভর করছে আমাদের সবার জীবন। তাই ঝুঁকি নিয়ে হলেও খুব কাছে গিয়ে গুলি করতে হবে যাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়।'

ক্যাপ্টেনকে এই বিপদের মাঝে যেতে দিতে আপত্তি জানালেন ডক্টর। হ্যাটেরাস তখন সবাইকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'ভয়ের কোন কারণ নেই। আমার কিছুই হবে না। সীল মাছের চামড়া পরে একদম কাছে গিয়ে দ্রুম ! ব্যস, ভালুক বাবাজী অক্কা পেয়ে যাবে। সীল মাছ দেখলে ভালুক মোটেও ভয় পায় না। বরং ভাল শিকার মনে করে গোঁফে তা দেয়।

পরদিন সকাল। ক্যাপ্টেন ইগলুর ভেতরেই সীলের চামড়াটা গায়ে জড়িয়ে নিলেন। ডক্টর বন্দুকে গুলি ভরে দিলেন। নলের ভিতরে পারদটুকু ঠেসে ভরা হল। ক্যাপ্টেন তৈরি হয়ে নিলেন। চামড়ার নিচে বন্দুক লুকিয়ে বের হয়ে পড়লেন তিনি।

ক্যাপ্টেনের কাণ্ড দেখে সবাই অবাক! এমনভাবে তিনি হেলেদুলে হামাগুড়ি দিয়ে বরফের উপর এঁকে বেঁকে চলতে লাগলেন যে কিছুতেই তাঁকে সীল মাছ ছাড়া অন্যকিছু বলে মনে হয় না। ক্যাপ্টেন চালাকি করে এদিক সেদিক ঘুরে আস্তে আস্তে ভালুকটার দিকে এগোচ্ছেন। যেন পথহারা সীল বরফের ফুটো খুঁজছে! সীল দেখেই ভালুকের চোখ আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠল। অসহায় সীল মেরে বেশ খাওয়া যাবে। কতদিন ভালুকটা শিকার পায়নি কে জানে!

যখন সীল মাছটা একদম কাছাকাছি চলে এল অমনি মহানন্দে ভালুকটা ছুটে গেল সীলের ঘাড় মটকাতে! কিন্তু বেচারা জানে না জীবনের সবচাইতে বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছে ওর জন্যে!

সীল মাছের হাততিনেক সামনে আসতে না আসতেই প্রচণ্ড ভয়ে পেছনের দুপায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে পড়ল ভালুক! ক্যাপ্টেন তার সীলের ছদ্মবেশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রণমূর্তি ধারণ করেছেন। মুহূর্তেই গুলি করলেন। অব্যর্থ নিশানা। গুলি সোজা ফুটো করে দিয়েছে ভালুকের হৃৎপিণ্ড। ভালুকের আর শিকার করা হল না। নিজেই পরিণত হল অন্যের শিকারে! মেরু অভিযাত্রীদের মাঝে আবার প্রাণের সঞ্চার হল।

পনেরো

ডক্টর আর জনসন ভালুকটার মাংস কেটে টুকরো টুকরো করে নিলেন। প্রায় দেড়শো পাউন্ড ওজন ভালুকটির। ডক্টর কিছুটা আশস্ত হলেন, যাক অন্তত বেশ কিছুদিন খাবারের চিন্তা করতে হবে না। একগাদা মাংসের টুকরো নিয়ে ওরা ফিরে এল ইগলুতে।

এতদিন অনাহারে থাকার পর একসঙ্গে এত মাংস দেখতে পেয়ে সবাই কাঁচা মাংসের ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি! কিন্তু ডক্টর সবাইকে বাধা দিলেন। বললেন, কাঁচা মাংস খেলে যে-কোন রোগে পেয়ে বসতে পারে। সুতরাং মাংস না পুড়িয়ে খাওয়া চলবে না।

এদিকে এক অঘটন ঘটে গেছে। সকাল থেকে সবাই ভালুক শিকারে এত ব্যস্ত ছিল যে স্টোভের আগুন কখন নিভে গেছে তা কেউই লক্ষ করেনি। এখন আগুন জ্বালাতে না পারলে মাংস পোড়ানো হবে কি করে? এ ব্যাপারে জনসন নিজেকে সবচেয়ে বেশি দোষী ভাবতে লাগল। কেননা একে তো তার লক্ষ রাখার কথা ছিল স্টোভের আগুন যেন না নেভে। উপরন্তু চকমকি পাথরে ঘষে আগুন জ্বালাবার জন্যে একটা ইস্পাতের টুকরো ছিল জনসনের পকেটে। সেটাও সে খুইয়ে বসেছে। চারদিকে তন্ন তন্ন করেও খুঁজে পাওয়া গেল না ইস্পাতের টুকরোটা।

ভীষণ বিপদে পড়ে গেছে অভিযাত্রীরা। আগুনের প্রয়োজন শুধু মাংস সেঁকার জন্যে নয়। এখন দিনের বেলা, সূর্যের তাপ আছে। কিন্তু রাতে আগুন না জ্বাললে শীতে জমে সবাইকে মরতে হবে। ক্যাপ্টেন দুঃখ করে বললেন, 'আমাদের কপালই খারাপ। সঙ্গে টেলিস্কোপ, ক্যামেরা বা লেন্স জাতীয় কোন কিছু নেই। থাকলে লেন্স দিয়ে সূর্যের আলো থেকে আগুন ধরানো যেত।'

ডক্টরও হতাশ সুরে সায় দিলেন ক্যাপ্টেনের কথায়! কিন্তু কি যেন ভাবছেন তিনি। কিছুক্ষণ পর ডক্টর বলে উঠলেন, 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলেছে। লেন্স আমি নিজেই বানাব।'

ডক্টরের কথা শুনে অন্যেরা তাঁকে ঘিরে ধরল নতুন প্ল্যান শুনবার জন্যে। কোথাও ভাঙা একটা কাঁচের টুকরো পর্যন্ত নেই। ডক্টর লেন্স বানাবেন কি দিয়ে?

'বরফ কেটে।' ডক্টর এবার বলতে লাগলেন তাঁর প্ল্যান। 'রোদকে একটা বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করার জন্যে লেন্স হলে সবচেয়ে ভাল হয়। তবে সূক্ষ্ম কৃস্টাল দিয়েও কাজ চলে। মিষ্টি পানির বরফের টুকরো দিয়ে আমি লেন্স বানিয়ে নেব। নোনা পানির বরফ দিয়ে হবে না, কেননা নুনের জন্যে সেটা অস্বচ্ছ হয়।'

অল্প কিছুক্ষণ খুঁজেই মিষ্টি পানির বরফের একটা টিলা বের করে ফেলল জনসন। ডক্টর প্রয়োজনমত একটা টুকরো কেটে নিলেন। চেঁচে ঘষে অল্প সময়ের মধ্যেই একটা সূক্ষ্ম কৃস্টাল বানিয়ে ফেললেন ডক্টর। তারপর কয়েকটা কাঠের টুকরো একসঙ্গে জড়ো করে তার উপর হাতে বানানো লেন্সটি ধরলেন তিনি। সূর্যকিরণ এক

বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হতেই দপ করে কাঠে আগুন ধরে গেল। অভিযাত্রীরা ডক্টরকে অভিনন্দন জানালেন, 'থ্রী চিয়ার্স ফর ডক্টর ক্লবোনি, হিপ হিপ হুররে! হিপ হিপ হুররে!'

ষোলো

ডক্টর ক্লবোনির বুদ্ধির জোরে অভিযাত্রীরা এযাত্রা রক্ষা পেল। ভালুকের মাংস খেয়ে সবাই হারানো শক্তি ফিরে পেতে লাগল। আলটামন্ট কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি বললেন, পরপয়েজে পৌঁছতে আর মাত্র দুদিনের পথ। এবার নতুন উদ্যমে যাত্রা শুরু হল।

ডক্টর কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ করে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন ক্যাপ্টেন ও আলটামন্টের সংঘাত। কথাটা তিনি জনসনকে না বলে পারলেন না। ডক্টর জনসনকে প্রশ্ন করলেন, 'বল তো, আলটামন্ট মেরুর অত কাছে কি উদ্দেশ্যে গিয়েছিল?'

জনসন অত প্যাঁচঘোচ বোঝে না। সে বলল, 'কেন, আলটামন্ট তো বললেন হিমশিলা জাহাজকে টেনে নিয়ে গেছে ওখানে।'

'ডাহা মিথ্যা কথা বলেছে আলটামন্ট! দেখনি, কথাটা বলার সময় ওর ঠোঁটে কেমন বাঁকা বিদ্রূপের হাসি লেগেছিল! আসলে আলটামন্টও মেরু অভিযানে বের হয়েছে। অর্থাৎ, আলটামন্ট এখন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের প্রতিদ্বন্দ্বী।'

যাই হোক, পথে সেদিন আর তেমন কিছু ঘটল না। ডক্টর নানান মজার কথা বলে পথ চলার ক্লান্তি অনেকটা কমিয়ে দিলেন। পরদিন শনিবার। অভিযাত্রীরা আশেপাশের পরিবেশে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করতে লাগল। বরফের টুকরোগুলো মিষ্টি জলের। বোঝা যাচ্ছে ধারেকাছেই স্থলভাগের দেখা মিলবে।

ওরা যতই পথ পার হচ্ছে ডক্টর ততই উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। নতুন ভূখণ্ডের মানচিত্র এঁকে ফেলার এক প্রচণ্ড নেশা চেপে ধরেছে তাঁকে। তিনি একের পর এক এঁকে চলেছেন নতুন দেশ, নতুন সমুদ্র, নতুন নদী। এভাবেই কেটে গেল আরও একটা দিন। পরদিন ডক্টরের রান্না করা সুস্বাদু খাবার খেয়ে শুরু হল ওদের যাত্রা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্লেজে শুয়ে থাকা আলটামন্টের উত্তেজনাও বেড়ে চলেছে। অন্যেরাও চরম উত্তেজনায় পথ চলছে আর সামনের দিকে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। অবশেষে ওদের খোঁজাখুজির অবসান হল। বেলা দুটোর দিকে আলটামন্ট স্লেজ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দূরে একটা বিরাটাকার বরফ স্তূপের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললেন, 'ওই যে পরপয়েজ!'

আলটামন্ট না দেখিয়ে দিলে ওরা পরপয়েজের হদিস পেত কিনা সন্দেহ! বরফে জাহাজটা পুরোপুরি ঢেকে রয়েছে। দেখলে মনে হয় প্রকাণ্ড এক হিমশিলা! সামনে এসে সবাই দেখল, জাহাজটা কাৎ হয়ে পড়ে আছে। মাস্তুল-গলুই সব বরফে ঢাকা। তলাটা ফেঁসে গেছে। প্রায় পনেরো ফুট বরফ কেটে তারপর ওরা জাহাজের ভাঁড়ার ঘরে পৌঁছল। ভাঁড়ার ঘরের মজুদ দেখে ওরা আনন্দে আটখানা হয়ে পড়ল। খাবার-

দাবার, রসদপত্র যা আছে তা দিয়ে অনায়াসে বছর দুই কাটানো যাবে। সাঁঝের আঁধার নেমে আসছে দেখে জাহাজের বাইরে চলে এল ওরা। তলা-ফাঁসা পরপয়েজে রাত কাটানো নিরাপদ নয়। তাই যথারীতি বাইরেই ইগলু বানিয়ে থাকতে হবে ওদের। সেদিনের মত ভালুকের মাংসের শেষটুকু দিয়ে রাতের খাবার খেয়ে নিলেন ডক্টর ও অন্যান্যরা।

পরদিন সকালে উঠে আর একবার জাহাজের ভেতরে ভাল করে সবকিছু দেখে নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল আশপাশটা ভাল করে দেখবার জন্যে। আলটামন্ট সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেননি বলে তাঁকে জাহাজে শুইয়ে রাখা হল।

ডক্টরের মাথায় নিত্য নতুন খেয়াল চাপে। এবার ইগলু নয়, বসবাসের জন্যে বরফের প্রাসাদ বানাবেন তিনি। অনেক কষ্ট হয়েছে এবার একটু আয়েশ করা যাক। অনেক খোঁজাখুঁজির পর প্রাসাদ বানাবার উপযোগী সুন্দর একটা জায়গা পাওয়া গেল। দূরে প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু এক পাহাড়ের পাদদেশ ঘেঁষে প্রায় দুশো ফুট সমতল অঞ্চল। ডক্টর তাঁর বরফ প্রাসাদ বানাবার জন্যে এ জায়গাটাই বেছে নিলেন। শুরু করে দিলেন কাজ। সবাই মিলে তিনদিনের মধ্যেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে ওই জায়গার বাড়তি বরফ পরিষ্কার করে ফেলল। প্রাসাদের নকশাও ইতিমধ্যে তৈরি করে ফেলেছেন ডক্টর। প্রাসাদটি হবে লম্বায় চল্লিশ ফুট, চওড়ায় কুড়ি আর উচ্চতায় দশ ফুট। তিনটে ঘর হবে। প্রথমটা রান্নার, মাঝেরটা আড্ডা মারার আর শেষেরটা শোবার। ডক্টরের উৎসাহে সবার ভেতরেই নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। মাত্র পাঁচ দিনেই তৈরি হয়ে গেল বরফ প্রাসাদ। প্রাসাদের দরজা জানালা সবই বরফের তৈরি। ঘরে আলো আসার জন্যে জানালা মত করে দেয়ালে স্বচ্ছ বরফের পাত লাগানো হল। এস্কিমোরা এভাবেই ইগলুতে আলোর মুখ দেখতে পায়। কিন্তু এতে ঠাণ্ডা বাতাস চলাচলের কোন ঝামেলা থাকে না। পরপয়েজ থেকে আসবাবপত্র এনে সাজানো হল ঘরগুলো। এরই ফাঁকে বরফ প্রাসাদ নির্মাণ সম্পর্কে ডক্টর একটা গল্প বললেন। তিনি বইতে পড়েছেন, ১৭৪০ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গে সম্রাজ্ঞী অ্যানের জন্যে তৈরি করা হয়েছিল একটা বরফ প্রাসাদ। রাজা-রাজড়াদের খেয়াল-প্রাসাদের সবকিছুই বরফের তৈরি হতে হবে। আর হলও তাই। প্রাসাদে ছিল ছয়টা কামান। সেই কামানগুলো, এমনকি তার গোলাও ছিল বরফের তৈরি। শুধু কি তাই, প্রাসাদের খাট-পালঙ্ক, চেয়ার-টেবিল, বিছানা, ড্রেসিং-টেবিল এমনকি ঘড়িটি পর্যন্ত বরফের!

ডক্টরের গল্প কৌতুকের মধ্যে দিয়েই আর একটা দিন পার হয়ে গেল। প্রাসাদের কাজও সব শেষ। এল ৩১ মার্চ। ইস্টার সানডে। ঘরে বসে গল্পগুজবে কেটে গেল পুরো দিনটা। পরদিন সকালে আবার কাজ শুরু হল। ভাঁড়ার ঘর এবং বারুদ ঘর তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। প্রাসাদের বাইরে বেশ খানিকটা দূরে ফাঁক ফাঁক করে দুটো ঘর তৈরি করা হল। উত্তরেরটা ভাঁড়ের ঘর আর দক্ষিণেরটা বারুদ ঘর। পরপয়েজ থেকে সমস্ত মালপত্র এনে দুই ঘরে ভরা হল। তারপর কুকুরদের জন্যে তৈরি হল আর একটা ঘর। তবে ডাক কিন্তু অন্য কুকুরদের সঙ্গে থাকতে চাইল না। ওর স্থান হল প্রধান প্রাসাদেই।

ঘরদোর তৈরির কাজ শেষ হতেই ডক্টর এবার পুরো প্রাসাদের চারদিক জুড়ে

পাঁচিল দিতে লেগে গেলেন। বরফের প্রাকার দিয়ে তিনি এমনভাবে চারদিক ঘিরে দিলেন–যেন পুরো এলাকাটাই একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ! এই এলাকায় যদিও কোন মানুষ বাস করে না কিংবা এস্কিমোদের উৎপাতও নেই। তবুও ডক্টর এত কষ্ট করে পাঁচিল দিলেন এই ভেবে যে, যদি কোন হিংস্র জন্তুর দল আক্রমণ করে তবুও সাত ফুট পুরু বরফের দেয়াল ভাঙতে পারবে না। মন থেকে অহেতুক ভয় দূর হল সবার। কাজে সাফল্য দেখে ডক্টর নিজেই নিজেকে বাহবা দিলেন, 'চমৎকার হয়েছে! ঠিক এমনটিই হওয়া প্রয়োজন ছিল।'

প্রাসাদ বানানো এবং সেটাকে সুরক্ষিত করার কাজে ডক্টর সফল হলেও দুই ক্যাপ্টেনের মধ্যেকার ঠাণ্ডা লড়াই মিটিয়ে ফেলার ব্যাপারে কিছুই করতে পারছেন না তিনি। ডক্টর যেন দিব্যচোখে দেখতেই পাচ্ছেন, ক্যাপ্টেন ও আলটামন্টের মধ্যে বড় ধরনের কোন সংঘাত। এর কারণ অবশ্য 'এক ঘর মে দো পীর' গোছের। এরা দুজনেই ক্যাপ্টেন, দুজনেরই অহমবোধ পুরো টনটনে। একজন ব্রিটিস, অন্যজন আমেরিকান। এই দুই জাতির জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের রেষারেষি আজকের নয়। সুতরাং কেউ কারও তোয়াক্কা করেন না। ক্যাপ্টেন বা আলটামন্ট কেউ কারও সঙ্গে ভদ্রতার খাতিরেও কোন কথা বলেন না। ডক্টর পড়েছেন মহা ঝামেলায়। কেননা, কিছু হলে সামলাতে হবে যে তাকেই!

ডক্টর মোটামুটি আনুষ্ঠানিকভাবেই বরফ প্রাসাদে 'গৃহ প্রবেশ' অনুষ্ঠান করলেন ১৪ এপ্রিল। এ উপলক্ষে বিশেষ খানাপিনার ব্যবস্থা করা হল। মজাদার খাবারের পর ডক্টর প্রস্তাব দিলেন তাঁরা এখন যে জায়গায় আছেন সেই জায়গা এবং তার আশেপাশের সবকিছুর নামকরণ করা যাক।

ডক্টরের প্রস্তাব সবারই মনে ধরল। প্রথমেই ক্যাপ্টেন তাদের বাড়িটার নাম দিলেন–ডক্টর হাউস। এ নামে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। সবাই একবাক্যে ক্যাপ্টেনের নামকরণে সম্মতি জানাল। আলটামন্টও এই নামকরণ খুশি মনে মেনে নিলেন। মেনে না নেয়ার কোন কারণই নেই। কেননা বরফ প্রাসাদের স্রষ্টা ডক্টর ক্লবোনি। তাছাড়া ডক্টরের বিচক্ষণ বুদ্ধির জন্যেই আজও সবাই বেঁচে আছে। 'ডক্টর হাউস নামকরণের পরই শুরু হল বিপত্তি। ক্যাপ্টেন এবার বললেন, 'এই দৈশ বা ভূখণ্ড যাই বলুন না কেন এটার একটা নাম দেয়া যায়। আমাদের আগে আর কোন মানুষ এখানে আসেনি···।'

ক্যাপ্টেনের কথা শেষ না হতেই আলটামন্ট রুখে দাঁড়ালেন। জোর গলায় তিনি বলে উঠলেন, 'আপনার কথা ঠিক নয়, ক্যাপ্টেন। আপনার আগে কোন মানুষ না এসে থাকলে পরপয়েজ জাহাজ এল কি করে?'

মিছে তর্কে মেতে উঠলেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। ডক্টর এঁদেরকে ছেলেমানুষি ঝগড়া থেকে বিরত করার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'আমরা কথা বলছি এ জায়গার নামকরণ নিয়ে, অন্য কোন প্রসঙ্গে নয়।'

'তা ঠিক! এ জায়গার নামকরণ আগেই করা হয়েছে,' আলটামন্ট বললেন।

সঙ্গে সঙ্গেই হ্যাটেরাস বিদ্রূপের সুরে বলে উঠলেন, 'কে করেছে নামকরণ, আপনি?'

'অবশ্যই। আমিই তো আগে এসেছি এই ভূখণ্ডে।'

'তা তো এসেছেন ঠিকই। কিন্তু, আমরা আপনাকে উদ্ধার না করলে বিশ ফুট বরফের নিচেই মরে পড়ে থাকতে হত, সে কথা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলেন?'

'মানলাম, কিন্তু আমি না থাকলে সবাইকে যে না খেয়ে শীতে জমে মরতে হত, সে কথাও কি নতুন করে বলতে হবে?'

ডক্টর দেখলেন, এখনই যদি এই বিতর্ক না থামানো যায় তাহলে কখন যে বিশ্রী কিছু একটা ঘটে যাবে কে জানে! তিনি বললেন, 'এ কি শুরু করেছেন আপনারা, ক্যাপ্টেন? আলটামন্ট যে এ ভূখণ্ডে আগে এসেছেন সেটা সবাই জানে। আর উনি যদি কোন নাম দিয়েই থাকেন তাহলে সেটা মেনে নিতে হবে বৈকি! কি নাম দিয়েছেন আপনি, আলটামন্ট?'

'নিউ আমেরিকা।'

নাম শুনেই ক্যাপ্টেনের রক্ত টগবগ করে উঠল। কিন্তু ডক্টরের ভয়ে আলটামন্টকে কিছু বলতে সাহস পেলেন না। তবে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, আলটামন্ট তো শুধু দেশটার নাম দিয়েছে। আমি ওই উপসাগরের নাম দিচ্ছি "ভিক্টোরিয়া বে"।'

ক্যাপ্টেনকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তক্ষুণি আলটামন্ট বলে উঠল, 'তাহলে ওই অন্তরীপটার নাম হোক "কেপ ওয়াশিংটন"।'

ডক্টর কাউকে কোন সুযোগ দিতে চান না। সুযোগ পেলেই ক্যাপ্টেন ও আলটামন্ট গণ্ডগোল বাধাবে। তাই একনাগাড়ে নাম দিয়ে চললেন, 'দূরের ওই দ্বীপের নাম হোক, "জনসন আইল্যান্ড"।' জনসন কিছুটা আপত্তি করতে চাচ্ছিল। কিন্তু ডক্টর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলে চলেছেন, 'পশ্চিমের পাহাড়টা হোক "বেল মাউন্ট"। আর এই দুর্গের নাম হোক "দৈব দুর্গ। দৈব যদি আমাদের সহায় না হত তাহলে ওয়াশিংটন কিংবা ভিক্টোরিয়া কারও কি সাধ্য ছিল আমাদের এখানে আনে?'

অকাট্য যুক্তি ডক্টরের। সবাই মেনে নিল তাঁর দেয়া নাম। এমনকি আলটামন্টও উল্লাসে সমর্থন জানালেন ডক্টর ক্লবোনির প্রতি। সমাপ্তি ঘটল দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সাময়িক তর্ক-বিতর্কের।

নির্মিত হয়েছে সুরক্ষিত 'দৈব দুর্গ'। নামকরণ হয়েছে নতুন ভূখণ্ডের, উপসাগর এবং অন্যান্য জিনিসের। অভিযাত্রীদের দিন কেটে যাচ্ছে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে।

সতেরো

ডক্টর ক্লবোনির মাথায় নিত্য নতুন খেয়াল চাপে। এবার তিনি ভাবলেন একটা লাইট হাউস তৈরি করা প্রয়োজন। আলোক-স্তম্ভ থাকলে ঘন কুয়াশা বা তুষার ঝটিকার মধ্যেও আলো দেখে বাড়ি ফেরা যাবে। পথ হারিয়ে বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না। লাইট হাউস বসানর জায়গাও বেছে নিয়েছেন ডক্টর। বরফ প্রাসাদের পেছনে যে

পাহাড়টা, সেটার চূড়া যথেষ্ট উঁচু এবং লাইট হাউসের জন্যে বেশ উপযোগী।

ডক্টর তাঁর নতুন প্রস্তাব পেশ করতেই আলটামন্ট জানতে চাইলেন, 'আলো কি দিয়ে জ্বালবেন, ডক্টর? সীলের তেল দিয়ে কি?'

'না, তেলের আলোর প্রখরতা অনেক কম। তেল দিয়ে চলবে না।'

'তাহলে কয়লার গ্যাস ছাড়া আর কি আছে!'

আলটামন্টের কথায় ডক্টর বেশ অবাক হয়েই বললেন, 'কি যে বলেন! নিজেকে বাঁচানর জন্যে কয়লা পাওয়া যায় না আর সেই কয়লা দিয়ে কিনা আলোক স্তম্ভ জ্বালাব।'

জনসন বুঝে ফেলেছে ডক্টরের মাথায় অন্য কিছু খেলছে। তাই সে বলল, 'ডক্টর নিশ্চয়ই আবার নতুন কিছু ভেবে বের করেছেন।'

এবার ডক্টর তাঁর পরিকল্পনার কথা বললেন, 'পরপয়েজের বুনসেন ব্যাটারি দেখেছি, সেটা নষ্ট হয়নি। ওটা দিয়েই আলোক স্তম্ভের বাতি জ্বালাব।'

বরফের চাঁই দিয়ে পাহাড়ের চূড়ার উপর দশ ফুট উঁচু একটা স্তম্ভ তৈরি করলেন ডক্টর। স্তম্ভের উপর বসালেন জাহাজের একটা বৈদ্যুতিক লণ্ঠন। সেটার সঙ্গে তার জোড়া লাগিয়ে সংযোগ নিয়ে এলেন বরফ প্রাসাদে। সেখানে রাখলেন ব্যাটারিটা। সন্ধ্যায় লণ্ঠনের কার্বন পেন্সিল দুটো মুখোমুখি ধরতেই ব্যাটারি চার্জে জ্বলে উঠল আলো। ডক্টর আর একবার তাঁর কেরামতি দেখিয়ে সবাইকে অবাক করলেন।

আবারও একঘেয়ে হয়ে উঠছে অভিযাত্রীদের জীবন। নতুন কিছুই করার নেই। বিরক্তিকর ঠেকছে সবকিছু। মাঝখানে সপ্তাহ খানেক আবহাওয়া খারাপ থাকায় প্রায় 'গৃহ বন্দী' অবস্থায় দিন কাটাতে হল সবাইকে। ২১ এপ্রিল আকাশ মোটামুটি ভাল থাকায় ডক্টর ক্লবোনি, আলটামন্ট ও বেল বের হল শিকারের খোঁজে। হাঁটতে হাঁটতে প্রায় পনেরো মাইল পার হয়েও কোন কিছুই পাওয়া গেল না। এদিক সেদিকে বরফের ফাঁক দিয়ে কিছু গর্ত দেখা গেল। সীল মাছ এসব গর্ত দিয়ে বের হয় শ্বাস নেয়ার জন্যে। ডক্টর ওদের জানালেন, এস্কিমোরা শীতের সঙ্গে লড়বার জন্যে গা গরম রাখতে দৈনিক প্রায় দশ থেকে পনেরো পাউন্ড সীলের মাংস খায়। ডক্টর কথা বলতে বলতেই লক্ষ করলেন, দূরে কি যেন একটা নড়ছে।

ডক্টর দূর থেকেই চিনে ফেললেন, ওটা সিন্ধুঘোটক। সবাইকে আওয়াজ করতে একদম বারণ করে দিলেন তিনি। তারপর তিনজন তিন দিক থেকে পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে বরফের আড়াল থেকে লুকিয়ে গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু গুলি ঠিক কাবু করতে পারল না সিন্ধুঘোটককে। তীরবেগে ছুটে পালাতে গেল। আলটামন্ট সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি হলেন না। ঝুঁকি নিয়ে সোজা পথ আগলে দাঁড়ালেন, আর ক্ষিপ্র বেগে কুঠারের আঘাতে কেটে ফেললেন সিন্ধুঘোটকের দুই পাখা। তবুও রক্তাক্ত দেহে গড়াগড়ি দিয়ে পালাতে চাইল প্রাণীটা। আবার গুলি ছুঁড়ল অভিযাত্রীরা। এবার বরফের উপর রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ল সিন্ধুঘোটক। ডক্টর মেপে দেখলেন, প্রাণীটা লম্বায় প্রায় পনেরো ফুট। তিনি শুধু সুস্বাদু মাংসের অংশটুকু কেটে নিয়ে বাকিটা ফেলে দিলেন।

ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। তবে তেমন অসুবিধা হয়নি। ডাক ওদেরকে অনেকটা পথ চিনিয়ে নিয়ে এসেছে। আর দৈব-দুর্গের কাছাকাছি আসতেই আলোক

স্তম্ভের আলো দেখে পথ চিনে নিতে কারও কোন কষ্ট হল না।

ডক্টরের অনেক গুণের একটি হচ্ছে রান্না। পাকা রাঁধুনিও হার মানবে তাঁর কাছে। সিন্ধুঘোটকের মাংস দিয়ে এমন সুস্বাদু কাটলেট বানালেন যা একবার খেলে সহজে কেউ ভুলতে পারবে না। কাটলেট খাওয়াবার পর কফি বানালেন ডক্টর। কফিতে চুমুক দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে মানুষের উত্তাপ সইবার ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি এমন এক গল্প বললেন যা শুনে সবাই অবাক। মানুষ নাকি তিনশো ডিগ্রি উত্তাপ পর্যন্ত সইতে পারে!

সবার শেষে খাওয়া শেষ করে কফিতে চুমুক দিয়েই আর্তনাদ করে বলে উঠলেন আলটামন্ট, 'ডক্টর কি আমাদের জিভ পোড়ানর বন্দোবস্ত করেছেন নাকি, যে এত গরম কফি খেতে দিয়েছেন?'

আলটামন্টের কথা শুনে ডক্টর বললেন, 'অভ্যাস থাকলে সবই পারা যায়।'

তারপর নিজের কাপে থার্মোমিটার ডুবিয়ে সবাইকে রিডিং দেখালেন-১৩১ ডিগ্রি! তারপর বেশ মজা করে চুমুক দিয়ে দিয়ে খেতে লাগলেন কফি। ডক্টরের দেখাদেখি বেলও যেই চুমুক দিয়েছে অমনি চিৎকার করে উঠল সে। গরমে জিভ পুড়ে গেছে তার।

ডক্টর বললেন, 'অভ্যাস না থাকলে এমনই হয়। কিন্তু অভ্যাস থাকলে যে কি বিস্ময়কর উত্তাপ মানুষ সইতে পারে তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। ফ্রান্সের এক রুটি কারখানায় কয়েকটি মেয়ে বাজি ধরে তিনশো ডিগ্রি উত্তাপে দশ মিনিট দাঁড়িয়েছিল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, এত উত্তাপেও ওদের কিছুই হয়নি অথচ পাশে রাখা ডিম আর মাংস সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।'

বরফ প্রাসাদে বসে ডক্টরের মুখ থেকে মানুষের অবাক করা ক্ষমতার কথা শুনে শীতের দিনেও যেন ঘেমে উঠল সবাই। সত্যি বড় আশ্চর্য মানুষের ক্ষমতা!

আঠারো

সময় আর কাটতে চায় না। প্রচণ্ড শীত। বাইরে বের হওয়া যায় না। ঘরেও করার কিছু নেই। বসে থাকতে থাকতে আলসেমিতে পেয়ে বসল সবাইকে। ডক্টর ভাবছিলেন এই বিরক্তি দূর করার জন্যে কিছু একটা করা দরকার। পূর্ববর্তী অভিযাত্রীরা এ ধরনের পরিস্থিতিতে কি করে সময় কাটাতেন সেই কথাটাই তাঁর মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। ডক্টর প্রস্তাব করলেন, 'আমরা যেভাবে শুয়ে-বসে সময় কাটাচ্ছি, এটা কিন্তু মোটেও ভাল হচ্ছে না। তারচেয়ে কিছু একটা করে সময় কাটানো যাক।'

আলটামন্ট জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু একটা-টা কি?'

'যেমন ধরুন খবরের কাগজ বের করা, কিংবা নাটক অভিনয়।'

ডক্টরের কথায় অন্যেরা তো অবাক! কি পাগলের মত কথা বলছেন ডক্টর। এখানে শীতের প্রকোপে সবাই অস্থির, আর তিনি কিনা খবরের কাগজ বের করতে

চান, নাটক করতে চান! ডক্টরের মাথাটা খারাপ হয়ে গেল না তো? না, ডক্টরের মাথা খারাপ হয়নি। শীতের একঘেয়েমি ও বিরক্তি কাটানর জন্যে পূর্ববর্তী অভিযাত্রীরা নিত্য নতুন বুদ্ধি বের করতেন। নানান মজাদার ও কৌতুকপূর্ণ খবর লিখে বের করতেন খবরের কাগজ। সেটা সবাই গোল হয়ে বসে পড়তেন। বেশ কিছুটা সময় কেটে যেত আনন্দ আর হৈ হুল্লোড়ে। তারপর সবার জানা নাটকের অংশ বিশেষ অভিনয় করত। এভাবেই তারা বরফ-বন্দী জীবনের একঘেয়েমি দূর করতেন।

ডক্টরের কথা জনসনের তেমন মনঃপূত হয়েছে বলে মনে হল না। নীরস ভঙ্গিতে হাই তুলে সে বলল, 'এরচেয়ে ঘুমই অনেক ভাল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নাটক আর সংবাদপত্রের স্বপ্ন দেখলেই চলবে। রাত অনেক হয়েছে–আমি চললাম ঘুমাতে।'

জনসনের কথায় ডক্টর ক্লবোনি কিছুটা মনঃক্ষুণ্ন হলেও মুখে কিছু বললেন না।

পরের দুদিন ঝড়ের তাণ্ডবলীলায় অভিযাত্রীরা বেশ ভয় পেয়ে গেল। ঝড় থামল ২৭ এপ্রিল। পরদিন সকালে ঘরের বাইরে এসে ডক্টর বেশ খুশি হয়ে উঠলেন। মেরু আবহাওয়া সম্পর্কে যথেষ্ট ভাল জ্ঞান রাখেন তিনি। তিনি বুঝলেন, শীতকাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর মাস খানেকের মধ্যেই ঋতু রাজ বসন্তের আগমন ঘটবে এই মেরু অঞ্চলে।

গত দুদিনের ঝড় বরফ প্রাসাদের উপর দিয়ে কি প্রলয়ঙ্কারী কাণ্ড ঘটিয়ে গেছে, তা দেখল অভিযাত্রীরা। অবিরাম তুষারপাতে প্রায় পনেরো ফুট উঁচু বরফস্তর জমে গেছে। আগের এবড়োখেবড়ো জায়গাগুলোও বরফে ঢেকে গিয়ে সমতল ভূমিতে পরিণত হয়েছে। সবাই মিলে গাঁইতি কোদাল দিয়ে বরফ কেটে দুর্গের পাঁচিলটা আবার ঠিক করে দিল। ভাঁড়ার ঘর থেকে কিছু খাবার-দাবার এনে মজুদ করল ওরা রান্নাঘরে। বিপদ-আপদের কথা কিছুই বলা যায় না, আবার কখন ঝড় শুরু হয়ে যায় কে জানে!

আবহাওয়া একটু ভাল হওয়াতে ডক্টর, আলটামন্ট ও বেল শিকারে বের হলেন। বেশ কিছুদূর গিয়ে তারা দেখতে পেলেন ভালুকের অসংখ্য পায়ের ছাপ। অভিজ্ঞ ক্লবোনি ভাল করে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলেন, গোটা পাঁচেক ভালুক দৈব-দুর্গের চারপাশ দিয়ে ঘুরেফিরে চলে গেছে। যেন আক্রমণের আগে 'রেকি' করে গেছে।

বিপদের গন্ধ টের পেয়েছেন ডক্টর। সত্যি সত্যিই ভালুকগুলো দৈব্য-দুর্গ প্রদক্ষিণ করেছে কিনা সেটা বোঝার জন্যে তিনি সমস্ত পায়ের ছাপ মুছে দিলেন। তারপর বললেন, 'কালকেও যদি এখানে পায়ের ছাপ দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে ভালুকদের লক্ষ্য এই দৈব্য-দুর্গ।'

পরদিন সকালে উঠে আবারও দেখা গেল ভালুকের পায়ের ছাপ। এবারে আরও কাছে এগিয়ে এসেছে ছাপ। ভালুকরা যেন আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। তবুও শেষবারের মত নিশ্চিত হবার জন্যে পায়ের ছাপগুলো আবারও মুছে দেয়া হল। পরদিন আর ভালুকের ছাপ আশেপাশে কোথাও পাওয়া গেল না। তবুও ঝুঁকি নিতে চাইলেন না ডক্টর। লাইট হাউসে গিয়ে পালা করে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। প্রথমে ছিল বেলের পালা। বেলের পালা শেষ হতে আলটামন্ট পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে ওকে ছুটি দিলেন।

বেল ফিরে আসতেই ক্যাপ্টেন সবাইকে নিয়ে বসলেন শলাপরামর্শে। বহুদিন ধরেই ক্যাপ্টেন সুযোগ খুঁজছিলেন তিন সঙ্গীকে নিয়ে আলোচনা করার। কিন্তু আলটামন্টের জন্যে কিছুতেই সুযোগ পাচ্ছিলেন না। আজ এ সুযোগ হাতছাড়া করলেন না তিনি। বললেন, 'আলটামন্ট এখন নেই। এই ফাঁকে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঠিক করে নিতে হবে। শীতের প্রকোপ মাসখানেকের মধ্যেই কেটে যাবে। শীত কমলে আমি কি করতে চাই তা নিশ্চয়ই আপনারা ভাল করেই জানেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি তা আগে জানা দরকার।'

ডক্টর এবং জনসন ক্যাপ্টেনের মনের কথা বুঝতে পেরে তাদের সম্মতি জানালেন। বেল কিছুটা আমতা আমতা করতে লাগল। ক্যাপ্টেন তাই সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন বেলকে, 'তুমি কি ঠিক করলে, বেল?'

'ক্যাপ্টেন, আমরা তো অনেক কষ্ট সহ্য করেছি। এবার দেশে ফিরলে কেমন হয়?' মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বেল।

ক্যাপ্টেন বুঝতে পারলেন ইংল্যান্ডের জন্যে মন টানছে বেলের। শুধু ওর কেন, সবারই। তাই স্নেহমাখা কণ্ঠে তিনি বললেন, 'দেখ বেল, আমরা অনেক দুঃখ কষ্ট সয়ে এতদূর এসেছি। সবচেয়ে ঠাণ্ডা অঞ্চলও পার হয়ে এসেছি। এখান থেকে আর মাত্র ৩৬০ মাইল গেলেই আমরা উত্তর মেরুতে পৌঁছতে পারব। তাছাড়া উত্তরে আর শীতের কষ্ট নেই। এতই যখন সয়েছ তো আর এই সামান্য কষ্টটুকু কি সইতে পারবে না?'

'অবশ্যই পারব, ক্যাপ্টেন। এতটা পথই যখন পেরিয়ে এসেছি তখন এ সামান্য পথটুকুও পার হতে পারব।' বেল দৃঢ়কণ্ঠে তার সম্মতি জানাল।

ক্যাপ্টেনের যত ভয় ওই আমেরিকান আলটামন্টকে নিয়ে। আলটামন্টও একজন ক্যাপ্টেন। এখন কে শুনবে কার কথা! কে করবে অধিনায়কত্ব? তাঁর মনের ভয়টা আগাম আভাস দিয়ে রাখলেন তাঁর সঙ্গীদের।

ডক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ পথে এবার যাত্রা শুরু হবে, ক্যাপ্টেন?'

'কেন, উপকূল ধরে চলব আমরা।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু যেতে যেতে যদি সামনে সমুদ্র পড়ে তাহলে কি করব আমরা? এজন্যে আগে থেকেই প্রস্তুতি নেয়া দরকার। আমার তো মনে হয় পরপয়েজ জাহাজের ভাঙা কাঠ দিয়ে একটা নৌকা তৈরি করে নিলেই হয়।'

এতক্ষণ ক্যাপ্টেনের মেজাজ ভালই ছিল। কিন্তু পরপয়েজের কাঠ দিয়ে নৌকা বানানর কথা শুনেই খেপে উঠলেন তিনি। বললেন, 'আমেরিকান জাহাজের কাঠ দিয়ে তৈরি নৌকায় মেরু কেন্দ্রে যাব আমি! তা কক্ষনো হতে পারে না!'

ডক্টর আর কোন কথা বলার সুযোগ পেলেন না। কেননা, আলটামন্ট ডিউটি শেষ করে ফিরে এসেছেন। সবাই চট করে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। আলটামন্ট ভালুকের ছায়াও দেখতে পাননি। সবাই নিশ্চিত হলেন, ভালুকগুলো নিশ্চয়ই অন্য কোথাও চলে গেছে। ওদের আর ভয় নেই। অভিযাত্রীরা আর পাহারা দেবার প্রয়োজনবোধ করল না। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। কিন্তু পরদিন সকালবেলা ওদের জন্যে কি সাংঘাতিক বিপদ অপেক্ষা করছে তা যদি ওরা ঘুণাক্ষরেও টের পেত তাহলে পাহারা তুলে নেয়ার কথা কেউ মুখেও আনত না।

পরদিন সকাল। জনসনকে ডক্টর হাউসের পাহারায় রেখে ক্যাপ্টেন, আলটামন্ট ও বেল শিকারে গেলেন আর ডক্টর গেলেন জনসন আইল্যান্ডে, ওখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ খুঁটিয়ে দেখতে। অল্প কিছুক্ষণ পরেই বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেয়ে কিছুটা অবাকই হল জনসন! আজ এত কাছাকাছি শিকার পাওয়া গেল? মনে মনে ভাবল সে। আবার শোনা গেল গুলির আওয়াজ। এবার বেশ খুশি হয়ে উঠল সে। আজ নিশ্চয়ই খানাটা বেশ মজাদার হবে। অনেক শিকার পাচ্ছে ওরা। কিন্তু ওর এই আনন্দের ভাবটা বেশিক্ষণ রইল না। বন্দুকের একটানা গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ ওকে বেশ দুশ্চিন্তায় ফেলল, চোখমুখ কালো হয়ে গেল অশুভ আশঙ্কায়!

ছুটে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠল জনসন। যা দেখল তাতে ভয়ে ওর হৃদস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম হল। পাঁচটা হিংস্র ভালুক ক্যাপ্টেন, আলটামন্ট, বেল ও ডাককে তাড়া করছে, নাগালের মধ্যে পেলেই এক থাবায় টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবে। প্রাণের মায়ায় জানপ্রাণ দিয়ে ছুটছে ওরা। বার বার গুলি করেও ভালুকগুলোকে কাবু করতে পারছে না। তাই প্রাণভয়ে ছুটছে আর একেকটা জিনিস ছুঁড়ে দিচ্ছে ভালুকগুলোর দিকে। ভালুকদের একটা বৈশিষ্ট্য হল, ওদের সামনে কোন কিছু ছুঁড়ে দিলে ওরা কয়েক সেকেন্ডের জন্যে হলেও থমকে দাঁড়িয়ে সেটা শুঁকবে। অভিযাত্রীরা ভালুকদের থমকে দাঁড়ানর সুযোগে নিজেদেরকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার ভালুকদের তাড়া খাচ্ছে ওরা। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ছুটছে ওরা ডক্টর হাউসের দিকে। শেষ পর্যন্ত কোনমতে ঢুকে পড়লেন আলটামন্ট, বেল ও ডাক। ক্যাপ্টেন দৌড়ে একটু পিছিয়ে ছিলেন, তাই ডক্টর হাউসে ঢুকতে গিয়ে অল্পের জন্যে বেঁচে গেলেন ভালুকের থাবার হাত থেকে। সময় মত বরফ কাটার চাকুটা ভালুকগুলোর দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন বলেই এ যাত্রা বেঁচে গেলেন তিনি। হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকে বন্ধ করে দিলেন দরজা।

ঘরে ঢুকেই জনসনের কথায় ডক্টরের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন। ডক্টর একা রয়ে গেছেন দ্বীপে। এখন কি হবে? ডক্টর যদি বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে সাবধান হয়ে যান তাহলে চিন্তার কোন কারণ নেই। কিন্তু যদি না শুনে থাকেন! তাহলে কিছুই না জেনে বেঘোরে ভালুকের হাতে প্রাণ দিতে হবে তাঁকে।

কিছু একটা করা দরকার। এখন উপায় একটাই। তা হল ভালুকগুলোকে তাড়ানো বা খতম করা। দুটোই বলা যত সহজ করা তত সহজ নয়। ঘর থেকে বেরুলেই ভালুকের থাবায় প্রাণটা খোয়াতে হবে। আলটামন্ট একটা বুদ্ধি বের করলেন। দেয়ালে একটা ফুটো করলেন তিনি তারপর ফুটো দিয়ে বন্দুকের নল ঢুকিয়ে দিলেন। নল দেখে ভালুক যেই সামনে এসে দাঁড়াবে অমনি গুলি ছুঁড়ে খতম করতে হবে। কিন্তু, আলটামন্ট ভাবতেও পারেননি ভালুকদের বুদ্ধির কাছে তাঁকে হার মানতে হবে।

আলটামন্ট বন্দুকের নলটা ফুটো দিয়ে বাইরে বের করতেই এক হ্যাঁচকা টানে বন্দুকটা কেড়ে নিল ভালুকের দল। ট্রিগার টেপার কোন সুযোগ পেলেন না তিনি। ভালুকদের আসুরিক শক্তির পরিচয় পেয়ে অবাক হলেন আলটামন্ট।

বাইরে ভালুকেরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। ভেতরে নিরুপায় অভিযাত্রীরা উত্তেজনায় অস্থির। বন্দুক কেড়ে নেয়ার পর দুটি ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। খিদেও

পেয়েছে বেশ। জনসন খাবারের ব্যবস্থা করল।

খেয়েদেয়ে ক্যাপ্টেন এক নতুন ফন্দি আঁটলেন। জনসনকে তিনি আগুন খোঁচাবার শিকটা তাতিয়ে লাল করতে বললেন। বুদ্ধিটা এরকম, তাতানো শিক বরফের ফুটো দিয়ে বের করলে ভালুকরা যেইমাত্র ধরবে অমনি ছ্যাঁকা খেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়বে আর সে সুযোগে বন্দুকের গুলি ছুঁড়বেন ক্যাপ্টেন।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। জনসন তাতানো শিকটা ফুটো দিয়ে বাইরে বের করে দিল। সঙ্গে সঙ্গেই ভালুকেরা শিক চেপে ধরেই বিকট চিৎকার করে উঠল। সেই সুযোগে দ্রুম দ্রুম গর্জে উঠল বন্দুক। আবার তাতিয়ে আনা হল শিক। বাইরে ভালুকগুলো গজরাচ্ছে। এবার ফুটো দিয়ে শিক ঢুকাতে গিয়ে দেখা গেল, কিসে যেন সেটা আটকে যাচ্ছে। আলটামন্ট বুঝে ফেললেন ব্যাপারটা। মুখ কালো হয়ে গেল তাঁর। ভালুকেরা বরফের চাঁই দিয়ে ফুটো বন্ধ করেছে, এর অর্থ একটাই– ভালুকেরা দম বন্ধ করে ওদের মারতে চায়। এদিকে পালাবার রাস্তাও বন্ধ। ভালুকদের এই চতুর পরিকল্পনায় সত্যিই অবাক হতে হয়। কি আশ্চর্যভাবে ওদের জব্দ হতে হচ্ছে পাঁচটা ভালুকের কাছে।

চিন্তায় পড়ে গেলেও বিপদে ভেঙে পড়ার লোক ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস নন। তিনি অভয় দিয়ে বললেন, 'অত ঘাবরাবার কিছু নেই। রাত নামুক। ছাদে ফুটো করে নেব। তাহলেই অক্সিজেনের অভাব হবে না আর। ফুটো দিয়ে প্রয়োজনে গুলিও ছোঁড়া যাবে। এত সহজে পরাজয় মেনে নেয়া চলে না।'

রাত নেমে আসতেই বেল দক্ষ হাতে খুব সাবধানে ছাদ ফুটো করা শুরু করল। এমন সময় হঠাৎ জনসন চিৎকার করে শোবার ঘরের পাহারা ছেড়ে ছুটে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, 'শোবার ঘরের দেয়ালে কেমন যেন খচখচ শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে বাইরে থেকে কারা যেন বরফের দেয়াল কাটছে। নিশ্চয়ই ভালুকগুলো ধারাল নখের আঁচড়ে বরফের দেয়াল কেটে আক্রমণ করতে আসছে।'

ভালুকগুলোকে প্রতিরোধ করার কোন উপায় ওদের জানা নেই। তার চেয়ে সরাসরি লড়ে মরাই ভাল। এক হাতে কুঠার আর অন্য হাতে ছুরি নিয়ে দেয়ালের দুপাশে ওঁৎ পেতে দাঁড়িয়ে গেলেন আলটামন্ট, ক্যাপ্টেন ও জনসন। আর বেল প্রস্তুত রইল বন্দুক নিয়ে।

খচমচ শব্দ দেয়ালের একদম কাছে চলে এল। উত্তেজনায় ঘরের সবাই ঘামছে। এবার দেয়ালটা একটু নড়ে উঠল। তারপরেই বরফের আস্তর ভেঙে কি যেন একটা ঘরের মেঝেতে এসে পড়ল। আলটামন্টও প্রস্তুত ছিলেন কুঠার নিয়ে। কুঠারটাকে পিঠের পিছন দিকে বাঁকিয়ে নিয়ে সজোরে নামিয়ে আনছিলেন কিন্তু মানুষের গলা শুনে থমকে গেল তাঁর হাত! পুরো ঘটনাটাই মাত্র দুতিন সেকেণ্ডের ব্যাপার!

'একি! আমাকে মারবেন নাকি?' গলাটা অতি পরিচিত এবং আকাঙ্ক্ষিত। হাতের কুঠার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে ডক্টরকে জড়িয়ে ধরলেন আলটামন্ট। ডক্টরকে নিজেদের মাঝে ফিরে পেয়ে অভিযাত্রীরা সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল।

জনসনের আনন্দ আর ধরে না! সে উল্লাস করে উঠল, 'ডক্টর যখন এসে

পড়েছেন তখন আর কোন ভাবনা নেই। এবার ভালুকগুলোকে উচিত শিক্ষা দেয়া যাবে।'

ডক্টরও জনসনকে উৎসাহিত করে বললেন, 'অবশ্যই; মজা দেখিয়ে ছাড়ব ওই পাঁচটাকে।'

বরফ কেটে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলেন ডক্টর। জনসন তাঁকে খেতে দিল। ডক্টর বললেন, তিনিও গুলির শব্দ শুনে টিলার উপর উঠে সবই দেখেছেন। দেখেছেন ভালুকদের তাড়া খেয়ে ক্যাপ্টেন, আলটামন্ট ও বেলের প্রাণপণ ছুট। তারপর বললেন, কিভাবে সুযোগ বুঝে চুপি চুপি বারুদ ঘর হয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা ছুরি দিয়ে বরফ কেটে তারপর পৌঁছলেন এই ঘরে।

এবার ভালুক জব্দ করার পরিকল্পনাটা সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন ডক্টর। সকালে একটা শিয়াল মেরেছিলেন তিনি, সেটাকে টোপ বানালেন। সারারাত ধরে সবাই মিলে সুড়ঙ্গ কেটে পথ বানালেন বাইরের ঢাল পর্যন্ত। ডক্টর এক খাসা ফন্দি বের করেছেন। সুড়ঙ্গ কাটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে সেই শিয়ালটিকে প্রায় একশো পাউন্ড বারুদের ওপর ভালভাবে বেঁধে সুড়ঙ্গের বাইরের দিকটার ছাদে তক্তা মুড়ে দিয়ে চেলাকাঠের সাহায্যে তা ঠেকনা দিয়ে রাখা হল। আর সেই ঠেকনার ওপর রইল শিয়ালটা। বারুদের সঙ্গে ইলেকট্রিক তার লাগিয়ে টেনে আনা হল ডক্টর হাউস পর্যন্ত। বারুদ জ্বালানর জন্যে এ এক নতুন বুদ্ধি। বারুদের ভেতর দুটো তারই মুখোমুখি জুড়ে দেয়া হল। সংযোগ রইল ডক্টর হাউসের ইলেক্ট্রিক ব্যাটারির সঙ্গে। যাতে স্পার্ক করালেই বিস্ফোরিত হয় বারুদ। একটা দড়ি বাঁধা খুটির গোড়ায়। দড়িটা বারুদ ঘর পর্যন্ত লম্বা, ওখানে জনসন অন্যপ্রান্ত ধরে বসে থাকবে। দড়ি ধরে টান দিলেই বরফের ছাদ ভেঙে পড়বে নিচে আর ভালুকদের জন্যে রাখা টোপ বের হয়ে আসবে খোলা আকাশের নিচে। ভালুকরা যেইমাত্র শিয়ালটার কাছে আসবে তক্ষুণি ব্যাটারির স্পার্ক দিয়ে বারুদে আগুন লাগাতে হবে। ব্যস, বিস্ফোরণে উড়ে যাবে ভালুক-বাবাজীরা।

প্ল্যান মাফিক বারুদ ঘরে বসে দড়ি ধরে হ্যাঁচকা টান দিল জনসন। বরফের আস্তর ভেঙে নিচে পড়ে গেল। ভালুকগুলোর সামনে আছড়ে পড়ল শিয়ালটা। প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও পর মুহূর্তেই ওরা ঝাঁফিয়ে পড়ল শিয়ালের উপর। ডক্টরও মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে ব্যাটারির সুইচ টিপে দিলেন। ব্যস, আর যায় কোথায়! প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল দৈব-দুর্গ। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সুড়ঙ্গ। বন্দুক হাতে বাইরে ছুটে এল অভিযাত্রীরা। চারটা ভালুকের ঝলসানো দেহ খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে আছে চারদিকে। আর অন্য ভালুকটা সারা দেহে আগুনের ছ্যাঁকা নিয়ে তীরবেগে পালিয়ে যাচ্ছে।

ভালুকের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অভিযাত্রীরা। বড় বিপদের হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলল ওদের।

উনিশ

হঠাৎ করেই যেন প্রকৃতি বদলে গেল। একদিনেই তাপমাত্রা উঠে গেল শূন্য তাপাঙ্কের পনেরো ডিগ্রি উপরে। বরফ অল্প অল্প করে গলতে শুরু করেছে। পাখিদের কলকাকলিতে প্রাণহীন মেরু অঞ্চলে আবার প্রাণের স্পন্দন ফিরে এসেছে। নাম না জানা কত পাখি উড়ছে আকাশে। জমির উপরও দেখা যাচ্ছে অনেক মেরুপ্রাণী। এমনকি নেকড়ের দলও কোথা থেকে যেন এসে হাজির হয়েছে। এরা কুকুরের গলার স্বর নকল করে ডাকে আর সুযোগ পেলেই অন্য প্রাণীদের ঘাড় মটকে দেয়।

জীবনধারা একদম পাল্টে গেল অভিযাত্রীদের। সারাদিন হৈ-চৈ আর শিকার। তারপর ডক্টরের সুস্বাদু রান্না। বেশ কেটে গেল ক'টা দিন। তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। শীতের প্রকোপ নেই বললেই চলে। এমন সুন্দর আবহাওয়ায় সপ্তাহ দুই পার হতে না হতেই উত্তরে হাওয়ার প্রকোপে হঠাৎ তাপমাত্রা নেমে গেল শূন্য তাপাঙ্কের ৮ ডিগ্রি নিচে। হঠাৎ করেই যেন থেমে গেল পাখিদের কলকাকলি আর পশুদের হাঁক ডাক। আবার বরফে ঢেকে গেল চারদিক।

প্রকৃতির এই পরিবর্তনে অভিযাত্রীদের চোখেমুখেও বিষাদের ছায়া নেমে এল। আবার শুরু হল শীতের কষ্ট পোহানর দিন!

ডক্টর সবার মনোভাব বুঝতে পারলেন। তবুও ওদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'মন খারাপ করার কিছু নেই। প্রতি বছরই এমন হয়। ১১, ১২ ও ১৩ মে, বছরের এই তিনদিনে আচম্বিতে শীত ফিরে আসে। সম্ভবত এই দিনগুলিতে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে এক ঝাঁক গ্রহ-নক্ষত্র চলে আসে অথবা বরফ গলতে থাকায় তাপমাত্রা শুষে নিয়ে শীত ডেকে আনে। তবে মজার কথা হল, এই শীত কিন্তু বেশি দিন থাকে না। অল্প ক'দিনেই চলে যায়!'

আবার কিছুদিনের একঘেয়েমি জীবন। ঘরে বন্দী থাকতে হল সবাইকে। এর মাঝেই বেলের হঠাৎ ডিপথেরিয়া হল। শুনলে অবাক লাগে, ডক্টর বেলের মুখে একটানা বরফ পুরে দিয়ে টনসিলের ফোলা কমিয়ে দিলেন। কয়েক ঘন্টার 'বরফ-চিকিৎসায়' সুস্থ হয়ে উঠল সে। এ অঞ্চলে কারও ডিপথেরিয়া হলে এভাবেই চিকিৎসা করা হয়।

বরফ-বন্দী জীবন অসহ্য লাগছে সবার। আবারও আলসেমিতে পেয়ে বসেছে সবাইকে। এরই ফাঁকে একদিন সুযোগ পেয়ে ডক্টর পরপয়েজের কাঠ দিয়ে নৌকা বানাবার ব্যাপারে ক্যাপ্টেনকে রাজি করানর চেষ্টা করলেন। প্রথমে ডক্টরের কথা শুনেই ক্যাপ্টেন রেগে টং হয়ে গেলেন।

ডক্টর ক্যাপ্টেনকে বুঝালেন, 'ক্যাপ্টেন, আপনি কিন্তু ছেলেমানুষের মত কথা বলছেন! কাঠের কি কোন জাত আছে? আপনার রাগ তো আলটামন্টের উপর। কাঠের উপর নয়। তাহলে পরপয়েজের কাঠ দিয়ে নৌকা বানাতে বাধা কোথায়?

তাছাড়া আপনিও জানেন বরফ গললেই সামনে পড়বে সমুদ্র। নৌকা ছাড়া আমরা কিছুতেই সামনে এগোতে পারব না।'

ডক্টরের কথায় কিছুটা শান্ত হলেন ক্যাপ্টেন। বললেন, 'ওই আমেরিকানটাকে আমি একদম সহ্য করতে পারি না। ওর যা হাভভাব–ও কি আমাদের কাঠ দেবে?'

'সে ভাবনা আমার। আলটামন্টের কাছ থেকে কাঠ ব্যবহারের অনুমতি আমি নেব।'

ডক্টর পেয়ে গেলেন ক্যাপ্টেনের সম্মতি। আনন্দে ঝিলিক দিয়ে উঠল তাঁর চেহারা। যাক, শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেনকে রাজি করানো গেল–মনে মনে ভাবলেন তিনি।

মে মাসের শেষ নাগাদ শীত কমে আসতে লাগল। পশুপাখিরা আবার ফিরে আসা শুরু করেছে। বরফগলা শুরু হয়েছে। নোনা জলের সঙ্গে বরফগলা পানি মিলে বিশ্রী এক ধরনের কাদায় অভিযাত্রীদের চলার পথ দুর্গম করে তুলেছে। এ কাদার আবার বাহারি একখানা নামও রয়েছে–স্লাশ।

বেল আর জনসন যথেষ্ট পরিশ্রম করে তৈরি করছে নৌকা। টাটকা খাবারের কোন অভাব নেই। প্রতিদিনই কিছু না কিছু শিকার করা হচ্ছে। এমনকি এই ক'দিনে বেশ কয়েকটা বল্গা হরিণও শিকার করল জনসন।

একদিন শিকার করতে গিয়ে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল সবার। এতে শিকারের নেশা অনেকটা কমে গেল অভিযাত্রীদের। শিকার করতে গিয়ে ওরা দেখল, খরগোস পায়ের কাছে লুকোচুরি খেলছে, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ওদের গায়ে কিংবা মাথায় বসছে, হরিণের দল একবার মাথা তুলেই আবার নির্ভয়ে পাতা খাচ্ছে–অর্থাৎ পশু পাখিরা ওদেরকে শত্রু মনে করতে পারছে না। এ দৃশ্য অভিযাত্রীদের মনকে প্রচণ্ড নাড়া দিল -কি হবে খামোকা নিরীহ প্রাণী হত্যা করে? তাছাড়া প্রচুর মাংস মজুদ আছে। অহেতুক শিকারে কারও মন সায় দিল না। তারচেয়ে মন খুলে প্রাণীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে আনন্দ করাই ভাল।

সময় এমনিতে ভালই কাটছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন ক্যাপ্টেন ও আলটামন্টের মধ্যে আবার ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। ঘটনাটা এরকম, সেদিন অভিযাত্রীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল পরবর্তী অভিযান নিয়ে। আলটামন্ট হঠাৎ বলে উঠল, 'আমরা যেখানেই যাই না কেন, কোন্ পথে আবার ফিরে আসব সেটা আগেই ঠিক করে নিতে হবে।'

আলটামন্ট এবং পরপয়েজ জাহাজের উদ্দেশ্য কি ছিল এই এক কথাতেই তা প্রকাশ পেয়ে গেল। হ্যাটেরাস সোজা প্রশ্ন করে বসলেন, "'যেখানেই যাই না কেন" বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন।'

আলটামন্টও কথায় কম যান না। তিনিও সোজা উত্তর দিলেন না। বললেন, 'আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেখানকার কথাই বলছি। তবে ফিরবার সময় আমাদের ফিরতে হবে অনাবিষ্কৃত নর্থওয়েস্ট প্যাসেজ দিয়ে।'

'নর্থওয়েস্ট প্যাসেজ'–অনাবিষ্কৃত: একথাটির প্রতিবাদ করতে চাইছিলেন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস। কিন্তু আলটামন্ট সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাসের নজির তুলে প্রমাণ করে দিলেন, আজ পর্যন্ত নর্থওয়েস্ট প্যাসেজে মানবজাতির কাছে অজানাই রয়ে

গেছে। তারপর আলটামন্ট যে কথা বললেন তা শুনে ডক্টর ক্লবোনি পর্যন্ত রেগে আগুন হয়ে গেলেন।

'পরপয়েজের কাঠ দিয়ে তৈরি নৌকা নিয়ে নর্থওয়েস্ট প্যাসেজ আবিষ্কার করার অধিকার একমাত্র আমারই রয়েছে।'

ডক্টর প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, 'আলটামন্ট, এ কিন্তু আপনার অন্যায় আবদার।'

'এ তো অন্যায় হবেই! কেননা আমি যে একা আর আপনারা তো চারজন।'

'তাহলে সেটা বুঝেই এখন থেকে সেভাবে কথাবার্তা বলুন,' বললেন ক্যাপ্টেন।

'আমাকে কি আপনার হুকুম মেনে চলতে হবে?'

'অবশ্যই!' ক্যাপ্টেনের দৃঢ় উত্তর।

আলটামন্ট আর কোন কথাই বললেন না। আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত 'ইয়াঙ্কি ডুডল' শিস দিয়ে গাইতে গাইতে শুয়ে পড়লেন তিনি। কারও বুঝতে বাকি রইল না আলটামন্ট কি বোঝালেন শিস দিয়ে!

বিশ

হরিণ ও খরগোসের নির্ভয় ছুটাছুটি দেখে কিছুদিন শিকার বন্ধ রাখলেও আবার একদিন শিকারে বের হলেন ডক্টর, আলটামন্ট ও ক্যাপ্টেন। সঙ্গে আছে ক্যাপ্টেনের প্রিয় সাথী ডাক। বেশ কিছুদূর যাবার পর ডাক দূরে দুটি জন্তুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওদের। মাটির খাঁজে শেওলা খেতে থাকা জন্তু দুটিকে ডক্টর দূর থেকেই চিনে ফেললেন, ওগুলো হচ্ছে কস্তুরী-ষাঁড়। দেখতে ভারি অদ্ভুত এই চারপেয়ে জন্তু দুটো। ছোট্ট চ্যাপটা মুখ। মাথায় বেঢপ সাইজের গোড়া মোটা শিং। লেজটাও বেশ ছোটই। সারা শরীর ঘন লোমে ঢাকা। আর চুলগুলি হল বাদামী রঙের। এদের মাংসে কস্তুরীর সৌরভ। দেখতে মনে হয় এরা দুটো প্রাণীর সংমিশ্রণে কিছু একটা।

ডক্টর বললেন, 'এদের মাংস খেতে দারুণ মজা। একবার খেলে সারাজীবন জিভে স্বাদ লেগে থাকে।'

ডক্টরের কথা শুনে সবাইকে নতুন করে শিকারের নেশায় পেয়ে বসল। এক মুহূর্ত দেরি না করে তিনজনেই ওই ষাঁড় দুটোকে মারার জন্যে ডাকের পিছন পিছন ছুটে গেলেন। প্রাণী দুটোও তিনজনকে এভাবে ছুটে আসতে দেখে এমন ভোঁ দৌড় লাগাল যে কিছুতেই ওদের বাগে আনতে পারলেন না ওঁরা। তখন ক্যাপ্টেন, আলটামন্ট ও ডক্টর ঠিক করলেন, তিনজন তিনদিক থেকে ঘিরে না ধরলে ষাঁড় দুটোকে কাবু করা যাবে না। তাই আস্তে আস্তে তিনদিক থেকে জন্তু দুটোকে ঘিরে এগোতে লাগলেন ওরা। যখন তিনজনই ষাঁড় দুটোর বেশ কাছাকাছি চলে এসেছেন তখন ক্যাপ্টেন একাই হঠাৎ এগিয়ে গেলেন ভয় দেখিয়ে ওই দুটোকে তাড়িয়ে আনতে। কিন্তু ফল হল উল্টো—দুটো ষাঁড়ই ক্যাপ্টেনকে তাড়া করল এবার। বিপদ

বুঝে তিনি গুলি ছুঁড়লেন। একটার কপালে গুলি লাগা সত্ত্বেও দুটোই একই গতিতে ক্যাপ্টেনের দিকে তেড়ে এল। আবার গুলি করলেন ক্যাপ্টেন। এবার অন্যটা খেপে গিয়ে তীরবেগে ছুটে এসে প্রচণ্ড ধাক্কায় তাঁকে মাটিতে ফেলে দিল। এই বুঝি শিংয়ের গুঁতোয় ক্যাপ্টেনকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় খ্যাপা জন্তু দুটো! ডক্টর দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফেললেন। এ দৃশ্য তিনি সইবেন কি করে!

আলটামন্ট তক্ষুণি তীরবেগে ছুটে গেলেন ক্যাপ্টেনকে বাঁচাতে। ক্যাপ্টেন আলটামন্টের যত বড় শত্রুই হোন না কেন এ বিপদে তাঁকে সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য। ষাঁড় দুটো যেইমাত্র পায়ের ক্ষুর আর মাথার শিং দিয়ে ক্যাপ্টেনকে আঘাত করতে যাবে অমনি আলটামন্টের গুলিতে একটা ষাঁড় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এতে দ্বিতীয়টা আরও খেপে গিয়ে শিংয়ের গুঁতোয় হ্যাটেরাসকে মাটির সঙ্গে বিদ্ধ করার জন্যে মাথা ঝাঁকিয়ে তেড়ে এল। দারুণ বিপদের ঝুঁকি নিয়েও আলটামন্ট তক্ষুণি জন্তুটার ওপর লাফিয়ে পড়ে কুঠারের এক আঘাতে সেটার মাথা দুফাঁক করে ফেললেন।

সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে আলটামন্টের প্রতি কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন। আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, 'আলটামন্ট, আপনাকে যে কি কৃতজ্ঞতা জানাব, সে ভাষা আমার জানা নেই। বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন আপনি।

'আপনিও একদিন আমার প্রাণরক্ষা করেছিলেন, ক্যাপ্টেন। আর আমি তো শুধুমাত্র মানবিক কর্তব্যই পালন করেছি।'

ক্যাপ্টেনকে অক্ষত পাবার আনন্দে ছুটে এসে দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন ডক্টর।

এই ঘটনার পর দুজনের শত্রুতা হাওয়ায় উবে গেল। দুজনেই দুজনের পরম বন্ধুতে পরিণত হলেন। এখন দুজনকে দেখে বোঝাই যায় না যে খানিকক্ষণ আগেও এঁরা একজন আরেকজনের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলেন। ডক্টর সুযোগ পেয়ে বলে উঠলেন, 'আমাদের সবারই লক্ষ্য অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা। কি লাভ জাতিগত বিদ্বেষ মনে পুষে রেখে? আমরা তো সবাই এই পথের পথিক। কে ইংরেজ আর কে আমেরিকান সেই খোঁজ না করে বন্ধুর মত, ভাইয়ের মত আনন্দে হুল্লোড়ে অনাবিষ্কৃতকে আবিষ্কার করাই সবচেয়ে ভাল নয়?'

ডক্টরের কথায় আলটামন্ট ও হ্যাটেরাস দুজনেই প্রথমে লজ্জায় কুঁকড়ে গেলেন, তারপর দুজন দুজনকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলেন যেন দুই সহোদর বহুদিন পর মিলছে একে অপরের সঙ্গে। আলটামন্ট ও ক্যাপ্টেনের বন্ধুত্বে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হলেন ক্লবোনি। ডক্টর হাউসে ফিরে এসে হৈ-চৈ করে বেল আর জনসনকে জানালেন সবকিছু। ওরাও কম আনন্দিত হল না। এ উপলক্ষে ডক্টর চমৎকার এক ভূরিভোজের ব্যবস্থা করলেন।

সময় বয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুত। জুন মাসের শেষ সপ্তাহ এসে গেছে। ক্যাপ্টেন আর অপেক্ষা করতে চান না। বরফ পুরোপুরি গলে যাবার আগেই রওনা হতে চান তিনি। মোটামুটি প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। স্লেজ মেরামত করে তাতে জিনিসপত্র উঠানো হয়েছে। পরপয়েজের কাঠে তৈরি নৌকাও তোলা হল স্লেজে। খাবার-দাবার, গোলা-বারুদ, তাঁবু ইত্যাদি মিলে জিনিসপত্রের ওজন প্রায় দেড় হাজার

পাউন্ডে গিয়ে ঠেকল।

এবার বিদায়ের পালা। বিদায় মানে ডক্টরের এত সাধের দৈব-দুর্গ থেকে বিদায়ের পালা। ২৪ জুন সকালে ডক্টর হাউস থেকে বেরিয়ে পড়ল অভিযাত্রীরা। এই ক'দিনে বরফ প্রাসাদের ওপর একটা মায়া জন্মে গিয়েছিল সবার। তাই যেতে যেতে সবাই বার বার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, আস্তে আস্তে দৃষ্টির আড়াল হয়ে যাচ্ছে বরফ প্রাসাদ।

পথ চলতে তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। পথ বেশ মসৃণ আর সমতল। স্লেজ তাই স্বচ্ছন্দ গতিতেই টানা যাচ্ছে। ডক্টর পথ নির্ণয়ে কিছুটা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছেন। কম্পাস ধরে উত্তরের কোন একটা কিছুকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেন। সেখানে পৌঁছে আবার দূরে অন্য কোন লক্ষ্যবস্তু নির্দিষ্ট করে চলতে থাকেন। এভাবেই সোজা সরল রেখায় উত্তর দিকে এগিয়ে চলেছে অভিযাত্রীরা।

তিনদিন চলার পর অভিযাত্রীদের সামনে পড়ল বরফ জমা এক হ্রদ। গ্রীষ্মের তাপ এখানে পৌঁছয় না। তাই বরফও গলে না। ডক্টর এবার বুঝতে পারলেন আলটামন্টের নিউ আমেরিকার বিস্তৃতি মেরু বিন্দু পর্যন্ত নয়। ওটার অবস্থান ছোট্ট একটা দ্বীপের মত।

আবার প্রকৃতির পরিবর্তন শুরু হয়েছে। তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে ৪৫ ডিগ্রিতে ঠেকেছে। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টি হওয়াতে ভালই হল কারণ এতে কুয়াশা কেটে যাবে। বৃষ্টির পানিতে পথ ধুয়ে পরিষ্কার হওয়ায় স্লেজ টানা আরও সহজ হল। মাসের শেষদিন অর্থাৎ ৩০ জুন শুরু হল ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলা। বরফের বড় বড় চাঙর ভেঙে পড়ছে। ভেসে যাচ্ছে সেগুলো দূরে কোথাও। বরফ পাহাড় ভেঙে গিয়ে সমতল ভূমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এত ঝড় ঝাপটা সত্ত্বেও নেহাতেই ভাগ্যগুণে ক্যাপ্টেন ও তাঁর সঙ্গীরা তেমন কোন বিপদের সম্মুখীন হলেন না।

জুলাই মাসের তিন তারিখে ওদের জন্যে নতুন এক অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছিল। পথ চলতে চলতে ওরা এমন এক এলাকায় এসে উপস্থিত হল যেখানে কয়েক মাইল জুড়ে তুষারের রঙ রক্তজবার মত লাল! তুষার গলে গিয়ে পানির যে স্রোত বয়ে যাচ্ছে তা দেখে মনে হয় যেন রক্তের নহর বইছে। ডক্টর ক্লবোনি আর একবার তাঁর বিশ্বকোষ খুলে বসলেন, বললেন, 'বিশেষ এক ধরনের ছত্রাকের জন্যে এই এলাকার পানি বা বরফের রঙ লাল হয়। প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে এই ছত্রাকের সংখ্যা প্রায় তেতাল্লিশ হাজার।'

পরদিন ঘন কুয়াশায় পথ চলাই দুষ্কর হয়ে উঠল। চারদিকের কোন কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। বারবার কম্পাস দেখে চলার পথ ঠিক রাখতে হচ্ছে। কুয়াশার জন্যে তেমন কোন দুর্ঘটনা না ঘটলেও বরফ-পাথরে হোঁচট খেয়ে বেলের জুতো ছিঁড়ে গেল।

কুয়াশার জন্যে গত তিনদিন দৈনিক মাত্র ৮ মাইল পথ চলা সম্ভব হয়েছে। তাই ৬ জুলাই কুয়াশা কিছুটা হালকা হয়ে যাওয়ায় ক্যাপ্টেন সবাইকে সঙ্গে নিয়ে জলদি বের হয়ে পড়লেন। আলটামন্ট ও বেল ডাককে নিয়ে খানিকটা আগে আগে চলল। বেশ কিছুদূর যেতেই প্রায় আধ মাইল পেছন থেকে ডক্টর দেখলেন, ওরা হঠাৎ কি যেন দেখতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেছে। মাটিতে ঝুঁকে কি যেন দেখে নিয়ে দিগন্তের

দিকে কিছু খুঁঝছে। এবার ডক্টর দ্রুত ছুটে গেলেন ওখানে। ওদের কাছাকাছি পৌঁছে ডক্টর নিজেও ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন।

ওদের চারপাশের বরফ প্রান্তরে ইউরোপীয় বুটের ছাপ–। এই ছাপ কোথা থেকে এল! তাহলে কি ওদের আগেই অন্য কেউ এ জায়গায় এসেছিল! দেখে বোঝা যাচ্ছে বুটের ছাপগুলো একদম নতুন। দুএকদিনের মধ্যেই কেউ এপথ দিয়ে গিয়েছে। ছাপ অনুসরণ করে তারা দেখল মাইলখানেক গিয়ে এ ছাপ পশ্চিম দিকে মোড় নিয়েছে।

অভিযাত্রীরা মুষড়ে পড়ল। হয়ত তারা মেরু বিন্দুতে গিয়ে দেখবে, তাদের আগেই অন্য কেউ সেখানে পৌঁছে গেছে! ক্যাপ্টেন আর দেরি করতে রাজি নন। পায়ের ছাপের রহস্য পেছনে পড়ে রইল। আবার উত্তরের পথে চলা শুরু হল। কিন্তু অজানা অভিযাত্রীর কথা ভেবে সবার মন এক বিশ্রী অস্বস্তিতে ভরে গেল।

সেদিন রাতেই প্রচণ্ড ঝড় শুরু হল। সারারাত চলল ঝড়ের প্রলয়-নাচন। ক্যাপ্টেন ও তাঁর সাথীরা কোনমতে একটা খাদের মধ্যে তাঁবু গেড়ে রাতটা ভয়ে ভয়ে কাটিয়ে দিল। ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই ঝড় গেল থেমে। আকাশও পরিষ্কার হয়ে গেল। ডক্টর, জনসন ও ক্যাপ্টেন একটা উঁচু পাহাড়ে উঠলেন ঝড় কি ক্ষতি করে গেছে তা দেখবার জন্যে। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে অবাক হয়ে গেল ওরা। মেরু প্রকৃতির এত দ্রুত পট পরিবর্তন চোখে না দেখলে যেন বিশ্বাসই করা যায় না। কুয়াশার কোন চিহ্নই নেই। বিদায় নিয়েছে শীত। এসেছে বসন্ত। বরফ নেই বললেই চলে। সমতল প্রান্তরে মাটি আর পাথরের কুচি দেখা যাচ্ছে। দূরে দেখা যাচ্ছে খোলা সমুদ্র। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কালচে বাষ্প।

ওরা পাহাড় থেকে নেমে এসেই হৈ-চৈ করে স্লেজে মালপত্র উঠিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে ছুটে চলল সমুদ্রের দিকে।

খোলা সমুদ্র। যতদূর চোখ যায় শুধু অথৈ সমুদ্র। স্থলভাগের কোন চিহ্নই নেই। কমলা লেবুর মত পৃথিবীর মানচিত্রে মেরুবিন্দুটা টেপা দেখানো আছে। আর এই সমুদ্রেই হচ্ছে সেই টেপা অংশটুকু।

সমুদ্র-সৈকতে এসে চারদিক ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন ডক্টর। সমুদ্রের ডানে আর বাঁয়ে দুটো অন্তরীপ। দুটোই সরু হয়ে মিশে গিয়েছে সমুদ্রে। মজার ব্যাপার হল দুই অন্তরীপের মাঝে যে পানিটুকু, তা একদম শান্ত। ঠিক যেন একটা উপসাগর। ঢেউয়ের গর্জন নেই। জেটির মত দেখতে বিরাট একটা পাথরের স্তূপও আছে সেখানে। ডক্টর আলটামন্টের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে জেটিটার নাম দিলেন 'আলটামন্ট বন্দর'। আলটামন্ট এখন ক্যাপ্টেনদেরই একজন। সুতরাং নামকরণে কোন বিপত্তি হল না।

সারাটা দিন ওদের কেটে গেল সমুদ্রযাত্রার প্রস্তুতি নিতে। স্লেজ তোলা হয়েছে নৌকায়। সমস্ত মালপত্রও তোলা হয়েছে। পরদিন সকালেই রওনা হবে অভিযাত্রীরা।

জুলাইয়ের ৮ তারিখ। ভোরবেলায় উঠে পড়েছেন ডক্টর। যাত্রার প্রস্তুতি প্রায় শেষ। তাঁবু এবং রাতে শোবার সবকিছু তোলা হয়েছে নৌকায়। একটু পরেই যাত্রা শুরু হবে। কিন্তু ডক্টর কেন জানি কি চিন্তা করে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অন্যেরা যাত্রার আগে পাথরের ওপর বসে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছে আর এই ফাঁকে কেউ

কেউ চা খাচ্ছে। ডক্টর চিন্তিত মনে এসে বসে পড়লেন ওদের সামনের একটা পাথরে। তারপর বেলকে লক্ষ করে বললেন, 'আমাকে এক কাপ চা দাও তো।'

বেল চা নিয়ে ডক্টরের সামনে এসে দাঁড়াল।

'নিন।'

ডক্টর মাথা নিচু করে বসে ছিলেন। বেল যখন 'নিন' বলল তখন হঠাৎ তাঁর চোখ এক ঝলকের জন্যে ওর পায়ের উপর পড়েছিল। বেলের জুতো লক্ষ্য করে ডক্টর এক লাফ দিলেন যে ওর হাত থেকে চায়ের কাপ ছিটকে পড়ে ভেঙে গেল। ভাগ্য ভাল, গরম চা কারও গায়ে পড়েনি। সবাই অবাক চোখে তাকাল ডক্টরের দিকে। ডক্টরের চোখেমুখে আনন্দের ছটা। তিনি হো হো করে হাসতে হাসতে বললেন, 'আমরা বুটের ছাপ দেখে খুব চিন্তিত ছিলাম, তাই না? সেই বুটপরা লোকটাকে আমি খুঁজে পেয়েছি!'

সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'কে সে? কোথায় সে?' 'কে সে? কোথায় সে?'

'এই যে এখানে সে!' বলেই বেলের দিকে আঙুল উঠালেন ডক্টর।

কুয়াশায় পথ চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে তুষার-জুতা ছিঁড়ে ফেলেছিল বেল। বুটের ছাপ ওরই বুট জুতোর।

এবার নিশ্চিন্ত মনে সবাই নৌকায় গিয়ে বসল। না, ভয়ের কোন কারণ নেই। ওদের কেউ অনুসরণ করছে না। সমুদ্র খুবই শান্ত। টলটলে স্বচ্ছ জল। এতই স্বচ্ছ যে নিচের সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নানা রঙের নানা আকৃতির নাম না জানা মাছ তরতর করে সাঁতরে যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে। যেন এক বিরাট অ্যাকোয়ারিয়াম–আর তাতে মাছেরা সব খেলা করছে!

মেরুযাত্রীদের নৌকা বাতাসের টানে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। নৌকার সঙ্গে সঙ্গে বিরাটাকৃতির পেঙ্গুইন, বিশাল ডানাওয়ালা অ্যালবেট্রস, আরও কত নাম না জানা পাখি আকাশের বুক চিরে উড়ে চলেছে।

আকাশের পাখি, জলের মাছ–এসব দেখতে দেখতে বেশ কেটে গেল একটা দিন। সন্ধ্যা নেমে আসতেই পাখিরা সব হাওয়া হয়ে গেল। রাত নামল। চারদিকে নিস্তব্ধ অন্ধকার। শুধু এগিয়ে চলেছ ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের পালতোলা নৌকা। মেরুবিন্দু জয় করতেই হবে–অভিযাত্রীদের লক্ষ্য একটাই।

একুশ

মেরু অভিযাত্রীদের নৌকা উত্তর দিকে এগিয়ে চলেছে। শান্ত সমুদ্র। সেইসঙ্গে নৌকার গতিও মন্থর। চলার গতি এতই ধীর যে তা সবার কাছেই বিরক্তিকর ঠেকছে। যতদূর চোখ যায় শুধু খোলা আকাশ আর সমুদ্রের অথৈ জল। ডাঙার চিহ্নমাত্র নেই। ক্যাপ্টেনের কোন ভাবান্তর নেই। একমনে তাকিয়ে আছেন উত্তর দিকে। সন্ধ্যার কিছু আগে বহুদূরে কি যেন আবছা কুয়াশার মত দেখা গেল।

আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন। নিশ্চয়ই ডাঙা হবে। ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলেন আরও কিছুক্ষণ। তারপর চিৎকার করে উঠলেন, 'ওই যে ডাঙা!'

ডক্টর ও জনসনও সায় দিলেন ক্যাপ্টেনের কথায়। কিন্তু আলটামন্ট বললেন, 'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে মেঘ।'

ক্যাপ্টেন আলটামন্টের কথার প্রতিবাদ করে আবার বললেন, 'ওটা ডাঙাই হবে।'

নৌকা আরও কিছুদূর যাবার পর দেখা গেল আগুনের স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। কোথায় ডাঙা! নৌকা আর একটু কাছে যেতেই চমকে উঠলেন ডক্টর, 'এ কি! এ যে দেখছি আগ্নেয়গিরি!'

'বরফের রাজ্যে আগ্নেয়গিরি?' আলটামন্টও কম অবাক হলেন না।

ডক্টর বলে উঠলেন, 'সুমেরুতে আগ্নেয়গিরি দেখে অবাক হবার কি আছে? জেমস রস কুমেরু অভিযানে এরেবাস ও টেরর নামে দুটো আগ্নেয়গিরি আবিষ্কার করেছিলেন। তাছাড়া, আইসল্যান্ড যে বরফের দেশ সেটাও তো আগ্নেয়গিরি দিয়েই তৈরি!'

সমুদ্রের ফুরফুরে বাতাস। দোলনার মত ঢেউয়ের মৃদু দুলুনি। নৌকার আরোহীরা, এমন কি ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের মত নিদহীন লোকের চোখেও ঘুম নেমে এল। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে যেন একখণ্ড ধোঁয়াটে মেঘ এসে শান্ত আবহাওয়া বদলে দিয়ে গেল। শুরু হল ঝড় আর সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ। মোচার খোলার মত লম্বাটে নৌকা ঝড়ের তোড়ে তীরবেগে ছুটে চলল উত্তর দিকে। সারারাত চলল এই তাণ্ডবলীলা। ভোর হয়ে আসতেই থেমে গেল ঝড়ের দাপট। দমকা বাতাসও বন্ধ হয়ে গেল। পালে যেন বাতাস ধরছেই না। নৌকার গতি আবারও ধীর হয়ে পড়ছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস ধীরে চলার লোক নন। দাঁড় টেনে নৌকা চালানর আদেশ দিলেন তিনি। কম্পাস দেখে ঠিক করে নিলেন পথ।

বাতাসের গতি পরিবর্তন হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, উপকূলের কাছাকাছি চলে এসেছে নৌকা। কুয়াশার আবরণে দূরের জিনিস একদমই দেখা যাচ্ছে না। এমন সময় হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় একমুহূর্তের জন্যে কুয়াশার আবরণ সরে গেল আর সেই মুহূর্তমাত্র সময়ে অভিযাত্রীরা অবাক চোখে চেয়ে দেখল, আগ্নেয়গিরির লেলিহান অগ্নিশিখার মাতম। আবার কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেল বুক কাঁপানো আগুনের শিখা।

হঠাৎ করেই আবার শুরু হল ঝড়। প্রকৃতির ওই ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলানোতে অসহায় হয়ে পড়ল অভিযাত্রীরা। মনে হচ্ছে যেন প্রকৃতি-দেবতা নানাভাবে বার বার বাধা দিচ্ছেন মেরু অভিযাত্রীদের। তিনি বোধহয় প্রকৃতির অনাবিষ্কৃত অংশটুকু আর মানব জাতির কাছে উন্মোচিত করতে চান না!

এবার ক্যাপ্টেন ও তাঁর সাথীরা পাগলা ঝড়ের পাল্লায় পড়ল। এই ডোবে এই ভাসে অবস্থায় ঝড়ের ঝাপটা নৌকাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। কিন্তু উত্তরে ডাঙা মাত্র তিন মাইল দূরে। হ্যাটেরাস ভীষণ হতাশ হলেন। তিনি দাঁড় টেনে উপকূলের দিকে নৌকা টেনে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু ঝড়ো হাওয়ার প্রবল টানে

খরকুটোর মত ভেসে চলল নৌকা। কিছুতেই নৌকার দিক পরিবর্তন করা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে এই বুঝি ডুবে যাবে!

একে তো নৌকা ডোবার ভয়ে সবাই অস্থির, তার ওপর ওদের বুকের রক্ত জমিয়ে দিল একটি দৃশ্য। নৌকার কয়েক শো গজ সামনেই একটা হিমবাহ ভেসে চলেছে। ওটারও ডুবু ডুবু অবস্থা। তবে ভয়ের কারণ কিন্তু হিমবাহের সঙ্গে সংঘর্ষ নয়। হিমবাহের ওপর একদল হিংস্র ভালুক। ভালুকগুলোও প্রকৃতির তাণ্ডবলীলায় ভয় পেয়ে গেছে। ভালুকগুলোর মতিগতি দেখেই বোঝা যাচ্ছে হিমবাহ ডুবলেই তারা নৌকায় উঠে বসবে। মাঝে মাঝে স্রোতের টানে সেই হিমবাহের একদম কাছে চলে আসে নৌকা। অভিযাত্রীরা তখন মনে মনে ঈশ্বরের জপ করে। ইচ্ছে করলে ভালুকগুলো লাফ দিয়েই উঠে আসতে পারে নৌকায়। আবার সরে যায় নৌকা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অভিযাত্রীরা। এভাবে চলল বেশ কিছুটা সময়। তারপর একসময় দূরে মিলিয়ে গেল হিমবাহ। ভালুকের হাত থেকে এ যাত্রাও বেঁচে গেল ওরা।

এক বিপদ যেতে না যেতেই আর এক বিপদ এসে হাজির! স্রোতের টানে নৌকা গিয়ে পড়ল এক মারাত্মক ঘূর্ণির ভেতরে। লাটিমের মত ঘুরতে লাগল নৌকা। ক্যাপ্টেন ও তার সঙ্গীদের অবস্থা শোচনীয়। মাথা ঘুরে সবাই বুঝি উল্টে পড়ে ঘূর্ণিজলে! ঘুরতে ঘুরতেই হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল নৌকা। তারপরই নৌকাসহ ওরা কামানের গোলার মত ছিটকে বেরিয়ে পড়ল ঘূর্ণিবৃত্ত থেকে। নৌকা সমেত সবাই আছড়ে পড়ল ডাঙায়। মাটিতে ছিটকে পড়লেন ডক্টর, জনসন, বেল ও আলটামন্ট। কিন্তু ক্যাপ্টেন কোথায়?

চারদিকে খোঁজাখুঁজি করল ওরা, ডাকল উচ্চস্বরে। ডক্টর বেশ কয়েকবার গুলিও ছুঁড়লেন, কিন্তু না, ক্যাপ্টেনের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

সবার মন খারাপ। শেষমেষ এ কি হল? মেরুবিন্দু আবিষ্কারের জন্যে যিনি এত পাগলামো করলেন; সইলেন এত ত্যাগ ও তিতীক্ষা; সেই বিন্দুর এত কাছে এসেও শেষটায় তিনি কিনা চিরদিনের মত হারিয়ে গেলেন! সাঁতরে ডাঙায় উঠবেন সে-শক্তিও নেই। ক্যাপ্টেনের এ করুণ পরিণতিতে সবাই ভেঙে পড়ল। মেরু বিজয়ের কোন উৎসাহই আর রইল না ওদের মাঝে। সবার চোখেমুখে বিষাদের কালো ছায়া নেমে এল।

রাত শেষ হয়ে আসতেই ঝড়ের দাপাদাপিও থেমে এল। ভোরের আলো ফুটে উঠতেই দেখা গেল কিছুদূরে আকাঙ্ক্ষিত সেই মেরুবিন্দু বা আগ্নেয়গিরি! সমুদ্রের ভেতর থেকে যেন ফোয়ারার মত ভেসে উঠেছে অগ্নি-পাহাড়। তীর বা পাদদেশ বলে কিছু নেই। দ্বীপটা আট থেকে দশ বর্গমাইল। প্রায় পুরোটাই জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। ক্রমাগত অগ্নুৎপাত হচ্ছে। লাভাস্রোত বয়ে গিয়ে মিশছে সমুদ্রের জলে। সমুদ্রের জল ফুটছে টগবগ করে। জ্বালামুখ থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে টকটকে লাল পাথরের টুকরো। কালো ধোঁয়া আর আগুনের লকলকে শিখা অদ্ভুত এক দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে।

অভিযাত্রীদের ভাগ্য ভাল, ঝড়ের তোড়ে আছড়ে পড়লেও তাদের নৌকার কোন ক্ষতি হয়নি। তাই নৌকা নিয়েই ওরা আগ্নেয়গিরির আরও কাছে এগিয়ে গেল

অল্পদূরে যেতেই পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটা খাঁজ দেখতে পেল ওরা। নৌকা ভেড়ানর জন্যে চমৎকার জায়গা। সেদিকেই ওরা টেনে নিয়ে চলল নৌকা। খাঁজের কাছে আসতেই ডাক নৌকা থেকে এলকাফে নেমে ছুটে গেল সেই পাহাড়ের দিকে। অনেক চেষ্টা করেও ডাককে ফেরানো গেল না।

বাইশ

এই সেই উত্তর মেরু—ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস যা আবিষ্কারের জন্যে বছরের পর বছর ধরে চেষ্টা করেছেন। মানব জাতির ইতিহাসে আজ এক বিশেষ স্মরণীয় দিন। অজেয়কে জয় করার স্পৃহা আদিকাল থেকেই মানুষের মাঝে লক্ষ করা যায়। আজ তারই এক সার্থক সাফল্যের দিন।

অভিযাত্রীরা গর্বিত; কিন্তু ক্যাপ্টেনকে হারানর শোকে সবাই মুহ্যমান। তবুও ওরা পা দিল উত্তর মেরুতে। আস্তে আস্তে এগোতে লাগল সামনের দিকে। দেখতে লাগল অগ্নুৎপাতের আশ্চর্য দৃশ্য। এমন সময়ে দূর থেকে ডাকের আওয়াজ শোনা গেল। ঘেউ ঘেউ ঘেউ।—মনে হচ্ছে ডাক যেন ওদেরকে ডাকছে। অভিযাত্রীরা ছুটল ডাকের আওয়াজ লক্ষ করে। কাছে এসে দেখল অদ্ভুত এক দৃশ্য। সারা গায়ে ইংল্যান্ডের পতাকা জড়ানো ক্যাপ্টেনের নিস্পন্দ দেহ পড়ে রয়েছে মাটিতে। ডাক সামনে দাঁড়িয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর ঝুঁকে পড়লেন ক্যাপ্টেনের দেহের উপর। হাতের কব্জি ধরে নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা করে দেখলেন ক্যাপ্টেনের দেহ নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ নয়। শরীরে তাপ আছে। হৃদস্পন্দনও ঠিক আছে।

'ক্যাপ্টেন বেঁচে আছেন!' বলে খুশিতে চিৎকার করে উঠলেন ডক্টর। অন্যেরাও ডক্টরের সঙ্গে মিলিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ল।

ওদের আনন্দ হুল্লোড়ে ক্যাপ্টেন সাড়া দিয়ে উঠলেন। ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'না আমি মরিনি। আমি বেঁচে আছি। আর হ্যাঁ, আমিই প্রথম উত্তর মেরুতে পা রেখেছি।'

সবাই অবাক হল ক্যাপ্টেনের কথা শুনে। জীবন যেখানে যায় যায় অবস্থা, সেখানেও তিনি মনে রেখেছেন তাঁর অন্তরের বাসনা। উত্তর মেরুতে প্রথম পা দেবার কথা!

ক্যাপ্টেন আস্তে আস্তে বললেন তাঁর রক্ষা পাবার কাহিনী। সমুদ্রে ছিটকে পড়ার পর স্রোতের টানে তীরে এসে আছড়ে পড়লেও বার বার ঢেউ তাঁকে একবার টেনে নিয়ে গেছে জলে আবার আছড়ে ফেলেছে তীরে। ক্যাপ্টেনের কোন শক্তিই ছিল না কোন কিছু আঁকড়ে ধরে উঠে পড়ার। ঠিক যেন লোনা জলের ফেনা ঢেউয়ের সঙ্গে আসছে আবার চলে যাচ্ছে। বেশ কয়েকবার এরকম হবার পর ঢেউ যখন তাঁকে আবার নিয়ে এল তীরে, তখন শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে ধরে ফেললেন একটা পাথর। এবার আর উল্টো স্রোত তাঁকে সমুদ্রে টেনে নিতে পারল না। বহুকষ্টে এক

পা দুপা করে উঠে এলেন তীরে। ঢেউয়ের নাগালের বাইরে। কিন্তু তিনি এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন ওই জায়গায়। তারপর ডাক এসে তাঁকে দেখতে পেয়ে সবাইকে ডেকে এনেছে।

সবারই খিদেতে পেট চোঁ চোঁ করছে। জনসন আর বেল সকালের নাস্তার সব ব্যবস্থা করে ফেলল। নাস্তা করতে যেতেই ক্যাপ্টেন নতুন গো ধরলেন। 'আগে মেরুবিন্দু ঠিক কোথায় সেটা বের করে নিই তারপর না হয় নাস্তা করা যাবে।' ক্যাপ্টেনের কথা ফেলবার সাহস কার আছে! তাঁর খ্যাপামির সঙ্গে এতদিনে সবাই যথেষ্ট পরিচিত হয়ে উঠেছে। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও যন্ত্রপাতি বের করে মাপজোক করতে লেগে গেলেন ডক্টর।

দেখা গেল, তারা যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড অর্থাৎ প্রায় পৌনে এক মাইল দূরে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের ভিতর মেরুবিন্দুর অবস্থান। এখান দিয়েই গিয়েছে ভূগোলকের অক্ষরেখা। সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দে হুল্লোড়ে নাস্তা সেরে ফেলল ওরা। তারপর মেরুবিন্দু আবিষ্কারের পুরো ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে ক্যাপ্টেনের সইসহ একটা কাগজে লিখে উত্তরসুরি অভিযাত্রীদের জন্যে পাহাড়ের গর্তে চাপা দিয়ে রাখল।

উত্তর মেরুতে এসে অভিযাত্রীরা আজ একদিকে যেমন আনন্দিত অন্যদিকে তেমনি ব্যথাতুর। আজ তারা সবচেয়ে বড় বিজয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত। যে জায়গা হাজার বছর ধরে মানুষের কাছে অজানা রয়ে গিয়েছিল আজ তা এদের করায়ত্ত। এরা সবাই মিলে করেছে এই অসাধ্য সাধন। এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে! কিন্তু একই সঙ্গে মনে পড়ে যায় ১৭ জনের দলটির কথা। সিম্পসন তো চোখের সামনেই চলে গেল আর এক অজানার পথে। শ্যানডন আর তার সঙ্গীরা কোথায় আছে, কেমন আছে কে জানে! বিশ্বাসঘাতকতা করলেও সে-ই তো পুরো অভিযানের সব ব্যবস্থা একান্ত নিজের মনে করে করেছিল। আজ যদি সবাই একসঙ্গে থেকে বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করতে পারত তাহলে কত মজাই না হত।

তেইশ

এত বড় বিজয়ের গৌরবে সবাই যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু জীবন্ত বিশ্বকোষ–জ্ঞানের ভাণ্ডার ডক্টর ক্লবোনি যেখানে থাকেন সেখানে চুপ করে বোবা হয়ে বসে থাকা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

সবার নীরবতা ভঙ্গ করে ডক্টর বলে উঠলেন, 'জনসন, তুমি কি জান, এখানে তুমি একদম নড়ছ না?'

জনসন ডক্টরের কথা ঠিক ধরতে পারল না।

'জ্বি! মানে আমি ঠিক বুঝলাম না, ডক্টর।'

'মানে তো খুবই সোজা। পৃথিবীর সঙ্গে পৃথিবীর লোকেরাও বনবন করে ঘুরছে। কিন্তু এ অংশ অর্থাৎ মেরুবিন্দু ঘুরছে না, তাই তুমিও স্থির থাকছ। দুই

মেরুই সবসময় স্থির থাকে।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস রাশভারী বেরসিক হলেও মাঝে মাঝে গম্ভীরভাবে এমন দুএকটা কথা বলেন যা শুনে সবাই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন, 'কথাটা কিন্তু একেবারে ঠিক নয়, ডক্টর। আমরা অল্প হলেও নড়ছি বৈকি! কেননা মেরুবিন্দু আরও পৌনে এক মাইল দূরে। ওখানে গেলেই আর সত্যি নড়ব না আমরা।'

'ওই একই কথা,' হাসতে হাসতে বললেন ডক্টর।

এভাবেই নানা বিষয়ে গল্পগুজব করতে করতে রাত নেমে এল। খাবারের পাট চুকিয়ে ক্লান্ত শরীরে শুয়ে পড়ল অভিযাত্রীরা। চোখে ঘুম নেই শুধু ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের। সারারাত জেগে রইলেন তিনি। এত বড় অসাধ্য সাধন করে এখনও কেন জানি শান্ত হয়নি তাঁর মন। মূর্তির মত একদৃষ্টে তিনি তাকিয়ে রয়েছেন জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের দিকে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই সবাই অবাক হয়ে দেখল, ক্যাপ্টেন তাঁবুতে নেই। কোথায় গেলেন ক্যাপ্টেন? তাঁবু থেকে ছুটে বের হয়ে এল ওরা। দেখল, কিছুদূরে একটা পাথরের ওপর যন্ত্রপাতি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন। একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তিনি আগ্নেয়গিরির দিকে।

ডক্টর কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে ক্যাপ্টেনকে ডাকলেন। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই, যেন শুনতেই পাননি তিনি। এবার বেশ জোরে ডাকতেই ক্যাপ্টেনের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। দেখলেন ডক্টর, আলটামন্ট, বেল ও জনসন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। ওদের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন, 'আপনারা আমার সঙ্গে যে সহযোগিতা আজ পর্যন্ত করে চলেছেন তার জন্যে আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। মেরু বিজয়ের গৌরব শুধু আমার একার নয়, এ গৌরব আপনাদের সবার। এমনকি যারা বিশ্বাসঘাতকা করে মাঝপথে আমাদের ফেলে পালিয়ে গেছে তাদেরও। যদি তারা ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে পারে তাহলে আমি আমার প্রতিশ্রুতি মত তাদের পাওনা ঠিকই মিটিয়ে দেব। যার যা পাওনা তা সে পাবেই।'

জনসন মুচকি হেসে ক্যাপ্টেনকে বলল, 'ক্যাপ্টেন, মনে হচ্ছে আপনি যেন উইল করে যাচ্ছেন!'

'হয়ত তাই।'

'কিন্তু আপনি তো এখন দিব্যি সুস্থ। মৃত্যু তো আর মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়ে নেই, যে এখনই উইল করতে হবে!'

'কেউ কি নিশ্চিত করে বলতে পারে সেকথা?' একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেনের এই উত্তরের পর কারও কিছু বলার রইল না। ওরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। ক্যাপ্টেন যেন কিছু একটা ইঙ্গিত দিতে চাইছেন। কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পর ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমরা মেরুদ্বীপে পা রাখলেও মেরুবিন্দু কিন্তু এখনও অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে।'

'মেরুদ্বীপ আর মেরুবিন্দু–সে তো একই কথা।' বললেন আলটামন্ট। ডক্টরও তাঁর কথায় সায় দিলেন।

'না। মেরুদ্বীপ আর মেরুবিন্দু এক কথা নয়!' রেগে গেলেন ক্যাপ্টেন।

'মেরুবিন্দুতে প্রথম যে পতাকা উড়বে সেটা হবে বৃটিশ পতাকা। আর সেই পতাকা ওড়ানো হবে আমার হাত দিয়ে—এই সঙ্কল্প নিয়েই ইংল্যান্ড থেকে বের হয়েছি আমি। আমরা মেরুদ্বীপে পৌছলেও মেরুবিন্দু এখনও পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড দূরে। আমাকে পা রাখতেই হবে মেরুবিন্দুতে!'

'আপনি কি জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিতে পা রাখবেন?' জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর।

'আমি যাবই।' উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস।

'ওখানে যাবেন কি করে? লাভাস্রোতের জন্যে ওই পাহাড়ে ওঠা যায় না।' আলটামন্ট বললেন।

'আমাকে যেতেই হবে।'

'কিন্তু জ্বালামুখ দিয়ে অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে যে!' ডক্টর তাঁর শেষ অস্ত্র ছুঁড়ে দিলেন।

'আমি যাবই যাব!' গমগমে গলায় বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেনের জন্যে এখন কোন বাধাই আর নয়। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তিনি যাবেনই মেরুবিন্দুতে। মেরু বিজয়ের উন্মত্ততা যেন পেয়ে বসেছে ক্যাপ্টেনকে। ডক্টর এবং অন্যেরা অনেক বোঝালেন, কিন্তু তাঁর সেই একই কথা, 'আমাকে যেতেই হবে।'

ডক্টর দেখলেন, এখন বাধা দিলে ক্যাপ্টেন মানবেন না, তাই অন্য ফন্দি বের করলেন তিনি। বললেন, 'আমরাও যাব আপনার সঙ্গে।'

'বেশ। মাঝপথ পর্যন্ত আপনারা যেতে পারেন। তারপর আর নয়। মেরু বিজয়ের সংবাদ নিয়ে আপনাদের ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে হবে।'

কারও আর বুঝতে বাকি রইল না ক্যাপ্টেন কি বোঝাতে চাইছেন। এ কেমন উন্মাদনায় পেয়ে বসল ক্যাপ্টেনকে! মৃত্যু অবধারিত জেনেও যেতে চাইছেন তিনি জ্বালামুখে!

ডক্টর বুঝলেন, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে এখন আর কোন কথা বলে লাভ হবে না। তাই সবাইকে নিয়ে তিনি পাহাড়ে ওঠার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন।

কিছুক্ষণ পর অভিযাত্রীদের যাত্রা শুরু হল। এবার আর বরফ বা সমুদ্রে নয়। জীবন্ত আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত জ্বালামুখে; যেখান থেকে বেরুচ্ছে উত্তপ্ত লাভাস্রোত। দাউ দাউ করে থেকে থেকে জ্বলে উঠছে আগুনের হলকা।

প্রথমে ডাক, তারপর ক্যাপ্টেন এবং পেছনে অন্যরা। এভাবেই লাইনবদ্ধভাবে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগল অভিযাত্রীরা।

পাহাড়ে উঠতে ডক্টর বললেন, 'এই পাহাড় একদমই নতুন সৃষ্টি হয়েছে। ভূতাত্ত্বিকরা দেখলেই বলে দিতে পারতেন এটার বয়স কত। আলগা পাথর আর লাভাস্রোত জমে হয়েছে এই পাহাড়। কোথাও ঘাস কিংবা ছত্রাকের জন্ম হয়নি। কীট পতঙ্গও নেই কোথাও। জ্বালামুখ দিয়ে বের হওয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে হাইড্রোজেন অথবা মেঘের এমোনিয়া মিশে গিয়ে সূর্য-কিরণের প্রভাবে জৈব পদার্থ সৃষ্টি হতে যে সময় প্রয়োজন সেই বয়সও হয়নি এই পাহাড়ের।'

ডক্টর আরও বললেন—অগ্নুৎপাত থেকে এভাবে অনেক পাহাড়ের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর বহু জায়গায় ভূগর্ভে প্রস্তর রাশি জমে ওঠে। ভৌগলিক কারণে সৃষ্ট

আগ্নেয়গিরি এসব পাথরের স্তূপ বের করে দেয় জ্বালামুখ দিয়ে। বিক্ষিপ্ত পাথর জমে সৃষ্টি হয় পাহাড়। এভাবেই মাউন্ট এটনার জন্ম হয়েছে। নেপলস্-এর কাছে মঁনুয়াভো পাহাড় মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে শুধু আগ্নেয় ছাই জমে সৃষ্টি হয়েছিল।

পৃথিবীকে একটি বর্তুলাকার বয়লার বলা যেতে পারে। বাষ্পের চাপ ক্রমাগত ভেতর থেকে বাইরে বের হতে চায়। এই চাপই যেখানে প্রবল সেখানে ভূ-ত্বক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে আগুন, লাভাস্রোত, ছাই। বাষ্পের এই বেরিয়ে যাবার মুখগুলোই হচ্ছে আগ্নেয়গিরি। চাপ কমে গেলে কখনও মুখ বন্ধ হয়ে থেমে যায় অগ্ন্যুৎপাত। আবার আরেক জায়গায় জেগে ওঠে নতুন জ্বালামুখ।

ক্যাপ্টেন নতুন দ্বীপের নাম দিয়েছেন কুইনস্ল্যান্ড। ডক্টর বললেন—এই দ্বীপটি যদি শতাব্দীর পুরানো হত তাহলে দেখা যেত দ্বীপের নানান জায়গায় গরম জলের ফোয়ারা আছে। পুরানো আগ্নেয়গিরির আশেপাশে এ ধরনের ফোয়ারা প্রায়ই দেখা যায়।

ক্যাপ্টেন ও তাঁর সঙ্গীরা যতই উপরে উঠছে ততই পথশ্রমে কাহিল হয়ে পড়ছে ওরা; এখনও অনেকটা পথ বাকি। পা যেন আর চলতে চাইছে না। ওপরে ওঠা রীতিমত কঠিন হয়ে পড়ছে। জ্বালামুখ থেকে ছিটকে বের হয়ে আসা উত্তপ্ত পাথরের টুকরো শিলাবৃষ্টির মত চারদিকে ঝরে পড়ছে। ধোঁয়া আর ছাইয়ের জন্যে সামনের কোন কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। তারপরেও আছে সাপের মত বেয়ে আসা লাভাস্রোত। যে-কোন মুহূর্তে একটু অসাবধান হলেই ঘটে যাবে মারাত্মক দুর্ঘটনা। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের এদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি সোজা উঠে চলেছেন পাহাড়ের গা বেয়ে। আরও অনেকটা উঠে এক শিলাচত্বরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। প্রায় দশ ফুট চওড়া পাথুরে চাতাল ঘিরে বয়ে যাচ্ছে লাভাস্রোত। এই দশ ফুট চওড়া লাভাস্রোত পার হলে সরু একটা পথ আছে উপরে ওঠার। কিন্তু পুরোটা পথই যথেষ্ট বিপদসঙ্কুল। ক্যাপ্টেন একটু থেমে ভেবে নিচ্ছেন কিভাবে পার হবেন এই পথ।

এদিকে ডক্টর, আলটামন্ট, বেল ও জনসনের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। ক্যাপ্টেন একটানা তিন ঘণ্টা পাহাড়ে উঠেও ক্লান্ত হননি। কিন্তু অন্যেরা আর পারছে না। ক্লান্তিতে ওদের হাঁটু ভেঙে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছে ওরা।

ডক্টর ভাবলেন, এবার কিছু একটা করা দরকার। ক্যাপ্টেন যেখানে যেতে চাইছেন সেই জ্বালামুখে যেতে হলে আগুনের স্রোত পেরিয়ে যেতে হবে; সেখানে হেঁটে যাওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ক্যাপ্টেন তাঁর কথার নড়চড় করতে নারাজ। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও একটানা তিনি উঠেই চলেছেন উপরের দিকে। যতই উপরে উঠছেন ততই তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত এক উন্মাদনায় পেয়ে বসেছে তাঁকে। কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠছেন ক্যাপ্টেন। মানসিক ভারসাম্যও যেন ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছেন তিনি।

ডক্টর এবার চড়া গলায় বলে উঠলেন, 'ক্যাপ্টেন, আমরা আর উপরে উঠব না। চলুন ফিরে যাই। কেন জেনেশুনে বিপদে পা দিচ্ছেন? আমরা তো মেরুবিন্দুতেই আছি।'

'না, ডক্টর! আমি ফিরে যেতে পারি না। মেরুবিন্দু আরও উপরে; অনেক উপরে! আমি সেখানে যাবই! আপনারা যেতে না চাইলে এখানেই বসে থাকুন।' অবিচল কণ্ঠে জবাব দিলেন হ্যাটেরাস।

'ক্যাপ্টেন!' এবারে অনুনয়ের সুর ডক্টরের কণ্ঠে।

'কোন কথা নয়!' খেপে উঠলেন ক্যাপ্টেন।

এবার ডক্টর বললেন, 'আমাদের কথা না শুনলে আমরা জোর করে হলেও–'

ডক্টরের কথা শেষ হল না; ক্যাপ্টেন বুঝে ফেলেছেন কি বলতে চান তিনি! কেউ কিছু বুঝে উঠবার আগেই অতি মানবিক প্রচেষ্টায় একলাফে তিনি পার হয়ে গেলেন লাভাস্রোত। ডাকও একই ভাবে লাফ দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করল। আশ্চর্য ব্যাপার! আগুনের ছিটেফোঁটাও তাঁর কিংবা ডাকের শরীরে লাগল না। একমাত্র বিশ্বস্ত সাথীকে সঙ্গে নিয়ে দিব্যি তিনি পার হয়ে গেলেন লাভাস্রোত। চলে গেলেন সঙ্গীদের নাগালের বাইরে।

আগুনের ধোঁয়া আর ছাইয়ের ভেতর হারিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু তাঁর চিৎকার ঠিকই শোনা যাচ্ছে। উন্মাদের মত চিৎকার করে তিনি বলে চলেছেন, 'আমি যাচ্ছি মেরু বিন্দুতে! মাউন্ট হ্যাটেরাসের মাথায়! তোমরা এই বিজয় সংবাদ পৌঁছে দিয়ো ইংল্যান্ডবাসীদের কাছে। পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়ো...'

আস্তে আস্তে ক্যাপ্টেনের গলার স্বর মিলিয়ে যেতে লাগল। ছুটে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে জোর করে ফিরিয়ে আনার মত সাহস বা শক্তি এখন আর কারও নেই। পথচলায় সবাই ক্লান্ত। লম্বা লাফে পার হতে হবে লাভাস্রোত। অতবড় লাফ দেয়া যেমন সহজ নয় তেমনি লাফ ফসকালে সোজা লাভাস্রোতে পড়তে হবে। সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে শরীর। তবুও বুকে সাহস সঞ্চয় করে লাফ দিতে চেয়েছিলেন আলটামন্ট। খামোকা ফোস্কা পড়ে গেল শরীরে। ডক্টর, বেল ও জনসন কোনমতে টেনে ধরাতে বড় ধরনের বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেলেন তিনি।

ক্যাপ্টেনের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন ডক্টর। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। শুধু ডাকের ক্ষীণ ঘেউ ঘেউ মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগল। এভাবে চরম উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ সময়। কখনও ক্যাপ্টেনকে একটু আধটু দেখা যায়। আবার কখনও একদমই দেখা যায় না। ক্যাপ্টেন যে কি দ্রুতগতিতে উঠে চলেছেন উপরের দিকে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। তিনি যেন ভোর বেলায় সমতলভূমির ওপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছেন! অল্প সময়ের ভেতরেই এত উপরে উঠে গেছেন যে তাঁর আকৃতি এখন অর্ধেক দেখাচ্ছে।

অগ্ন্যুৎপাতের বিকট আওয়াজ, চারদিকে অগ্নিস্রোতের নহর, মাঝে মাঝেই পাহাড় থেকে খসে পড়ছে বড় বড় পাথর। যে-কোন মুহূর্তে মৃত্যু ছোবল মারতে পারে। ক্যাপ্টেনের সেসব খেয়াল নেই। পাহাড়ে ওঠার লাঠিতে ইংল্যান্ডের পতাকা বেঁধে সেটা নাড়াতে নাড়াতে উঠে চলেছেন উপরে, আরও উপরে। পাহাড়ের শিখরে–জ্বালামুখের দিকে!

নিচ থেকে ডক্টররা দেখলেন, কিভাবে ক্যাপ্টেন অসম্ভবকে সম্ভব করে চলেছেন। কখনও ছাইয়ের ভেতর তাঁর কোমর পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে আবার কখনও বা চোখা পাহাড় ধরে ঝুলতে ঝুলতে এগিয়ে যাচ্ছেন। হাত ফসকালেই কয়েক শো

গজ নিচে লাভাসমুদ্রে পড়তে হবে। প্রায় একঘণ্টা এভাবে প্রতি মুহূর্তে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অবশেষে পৌঁছুলেন জ্বালামুখের শীর্ষে। মাউন্ট হ্যাটেরাসের চূড়ায়।

ক্যাপ্টেনের করুণ পরিণতির কথা ভেবে ডক্টরের দুচোখ পানিতে ভরে গেল। দুঃখ-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে তিনি ডাকলেন, 'ক্যাপ্টেন! হ্যাটেরাস!'

কিন্তু যার প্রতি এই আহ্বান, তিনি তখন অন্য জগতের বাসিন্দা। উদভ্রান্তের মত জ্বালামুখের ধার ঘেঁষে হেঁটে চলেছেন ক্যাপ্টেন। চারপাশে বৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে জ্বলন্ত শিলা। কোন কোনটা ক্যাপ্টেনকে প্রায় ছুঁয়ে যাচ্ছে। তবুও একই গতিতে এগিয়ে চলেছেন হ্যাটেরাস। নির্বিকার, অকুতোভয় ক্যাপ্টেন মেরুবিন্দুর খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন।

ক্যাপ্টেনের সম্ভাব্য পরিণতি আলটামন্ট কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। ডক্টর বাধা দেবার আগেই একলাফে পার হয়ে গেলেন ১০ ফুট লাভাস্রোত। ক্যাপ্টেনকে বাঁচানর এক প্রবল কর্তব্যবোধ ও নৈতিক দায়িত্ব জেগে উঠেছে তাঁর মনে। যেভাবেই হোক হ্যাটেরাসকে বাঁচাতেই হবে। আলটামন্টও যেন এক অলৌকিক শক্তি পেয়ে গেছেন। তীরবেগে তিনি ছুটে চললেন ক্যাপ্টেনের দিকে।

ইংল্যান্ডের ফ্ল্যাগ হাতে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস হেঁটে চলেছেন একটা ঝুলন্ত পাথরের উপর দিয়ে। যে-কোন মুহূর্তে খসে পড়তে পারে পাথরের বিরাট চাঙরটা। পাথরটা ঝুলে আছে জ্বালামুখের সঙ্গে–যেখান থেকে বের হচ্ছে লাভাস্রোত; ছিটকে বেরিয়ে আসছে উত্তপ্ত শিলা। ক্যাপ্টেন যেন ঠিক ওখানেই যেতে চান। পা রাখতে চান মেরুবিন্দুর উপর–হোক সেটা জ্বালামুখ কিংবা অন্যকিছু!

জ্বালামুখ লক্ষ্য করে নির্ভয়ে এগিয়ে চলেছেন ক্যাপ্টেন। এমন সময় হঠাৎ নড়ে উঠল সেই ঝুলন্ত পাথর। সঙ্গে সঙ্গে ঝুর ঝুর করে পাথরের কুচি খসে পড়তে লাগল জ্বালামুখের গহ্বরে। অজানা ভয়ে আপনা থেকেই চোখ বন্ধ হয়ে এল সবার। সবই বুঝি শেষ হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসকে আর বোধহয় বাঁচানো গেল না। হ্যাটেরাসের দেহ নির্ঘাত গিয়ে পড়ছে জ্বলন্ত জ্বালামুখে।

ঈশ্বর যার সহায় তার মৃত্যু এত সহজ নয়! ঠিক সময়মত পৌঁছে গেলেন আলটামন্ট। টেনে ধরে তুললেন পতোন্মুখ ক্যাপ্টেনকে। এ যাত্রা বেঁচে গেলেন ঈশ্বরের অশেষ কৃপায়। আলটামন্টের পৌঁছতে যদি আর এক সেকেন্ডও দেরি হত তাহলে ক্যাপ্টেনকে আর বাঁচানো সম্ভব ছিল না। আলটামন্ট ফিরে এলেন ক্যাপ্টেনের সজ্ঞাহীন দেহ নিয়ে।

কিন্তু এ কাকে নিয়ে এলেন আলটামন্ট!

চব্বিশ

ডক্টরের সেবা শুশ্রূষায় সজ্ঞাহীন ক্যাপ্টেনের জ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু এ কি দশা হয়েছে তাঁর? ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে সবাই যেন হতবাক হয়ে গেছে! জ্ঞান ফিরে

পেয়ে অবোধ শিশুর মত বোকা চোখে তাকিয়ে আছেন হ্যাটেরাস। নিষ্পলক চোখ। যেন সামনের কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। ক্যাপ্টেনের চোখে চোখ রাখলেন ডক্টর। কিন্তু ডক্টরের উপস্থিতি তিনি টের পেলেন বলে মনে হল না। ক্যাপ্টেন অন্ধ হয়ে গেলেন কিনা ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়ল জনসন। ডক্টর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ক্যাপ্টেন অন্ধ হননি ঠিকই তবে তারচেয়ে বড় ক্ষতি হয়ে গেছে তাঁর। হ্যাটেরাস মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। চেতনা শক্তি লোপ পেয়েছে তাঁর। ক্যাপ্টেন পাগল হয়ে গেছেন! একদম পাগল!' ডক্টর নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলেন না। শিশুর মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তারই সবচেয়ে বেশি হৃদ্যতা ছিল। এতদিনের অভিযানে বন্ধুত্ব আরও নিবিড় হয়েছিল। বন্ধুর এই দুঃখজনক পরিণতি কিছুতেই তিনি মেনে নিতে পারছেন না।

ডক্টর ক্লবোনি কাজের মানুষ। বন্ধুর দুঃখে মন ভেঙে পড়লেও ভাবাবেগে চলার লোক তিনি নন। ক্যাপ্টেনকে ধরে ধরে সবাইকে নিয়ে পাহাড় থেকে নিচে নামা শুরু করলেন তিনি। প্রায় তিন ঘণ্টা লেগে গেল নিচে পৌঁছতে। পাহাড়ের পাদদেশে নেমে বিশ্রাম নিয়ে পরবর্তী পরিকল্পনা স্থির করলেন ডক্টর। রাতটা কোনমতে এখানে কাটিয়ে দিয়ে কাল ভোরে রওনা হবেন দৈব-দুর্গের পথে। শীতকালটা দৈব-দুর্গে কাটিয়ে গরম পড়তে শুরু করলেই ইংল্যান্ডের পথে রওনা হওয়া যাবে।

পরদিন অর্থাৎ ১৩ জুলাই খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠল অভিযাত্রীরা। মাউন্ট হ্যাটেরাস ছেড়ে যাবার আগে, যেখানে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস অচেতন অবস্থায় পড়েছিলেন, সেখানে একটি স্তম্ভের মত তৈরি করে তাতে লেখা হল।

জন হ্যাটেরাস

১৮৬১

অর্থাৎ প্রথম মেরু বিজয়ীদের স্মৃতি। অভিযানের বিশদ বিবরণ একটা টিনের বাক্সে ভরে রেখে দেয়া হল সেই স্তূপের ভেতর। ভবিষ্যতে যদি কোন অভিযাত্রী দল এতদূর পৌঁছতে পারে তাহলে জানতে পারবে, তাদের আগেই ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস ও তাঁর সঙ্গীরা এই অজেয়কে জয় করে গেছেন। জানতে পারবে, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে গিয়েছিলেন এই অসাধ্য সাধন করতে গিয়ে।

আবার নৌকায় চড়ে যাত্রা শুরু হল। আবহাওয়া অনুকূলে হওয়ায় নৌকা তরতরিয়ে চলল। মাত্র দুদিনে অভিযাত্রীরা পৌঁছল আলটামন্ট বন্দরে। সেখান থেকে সমুদ্রের উপকূল ঘেঁষে সমুদ্রপথেই তারা রওনা হল দৈব-দুর্গের পথে। পালের অনুকূলে হাওয়া থাকায় পনেরো দিনের পথ মাত্র সাতদিনে পাড়ি দিল ওরা; পৌঁছল ভিক্টোরিয়া বে হয়ে দৈব-দুর্গে।

দৈব-দুর্গে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল এক দুঃসংবাদ। বরফ প্রাসাদ গলে মিশে গেছে! কোথায় ভাঁড়ার ঘর আর কোথায়ই বা বারুদঘর। সব গলে মিশে সমতল ভূমির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। খাবার-দাবার যা ছিল সব লুটেপুটে খেয়েছে হিংস্র জন্তুজানোয়ারের দল। এখন উপায়! মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল সবাই। দারুণ হতাশায় পেয়ে বসল সবাইকে। কিন্তু ডক্টর কখনই আশার হাল ছাড়েন না। আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উচ্ছিষ্টের মধ্যে থেকে যেটুকু খাবার-দাবার তিনি উদ্ধার করলেন তা দিয়ে সপ্তাহ ছয়েক অনায়াসে চলে যাবে।

ডক্টর দেখলেন, আর দেরি না করে এখনই রওনা হয়ে পড়লে এই ছয় সপ্তাহে পৌঁছে যাওয়া যাবে বাফিন উপসাগরে। সেখান থেকে তিমি শিকারিদের জাহাজ বা অন্য কোন উপায়ে ডেনিশ উপনিবেশে পৌঁছানো যাবে।

আবার শুরু হল যাত্রা। শীতে বরফ জমা শুরু হবার আগেই পৌঁছতে হবে পরবর্তী লক্ষ্যে। তাই ডক্টরের হুকুমে দিনরাত একটানা ছুটে চলল নৌকা। বিশ্রামের জন্যে কোথাও নৌকা ভেড়ানো হল না। আরাম হারাম হয়ে গেল সবার। এত দ্রুতবেগে চলার পরেও দেখা গেল আস্তে আস্তে তাপমাত্রা কমে আসছে। এদিক-সেদিক ছোট ছোট হিমশিলা সাগরের বুক চিরে বারে বারে উঁকি দিচ্ছে। চলার পথ ক্রমেই বন্ধ হয়ে আসছে। বরফ ঠেলে চালাতে গিয়ে অসংখ্যবার ভাঙতে ভাঙতে বেঁচে গেল ওদের নৌকা। শেষ পর্যন্ত চারদিক থেকে হিমবাহ এমনভাবে পথ আটকে দিল যে নৌকা আটকে গেল বরফে। অগত্যা নিরুপায় অভিযাত্রীরা স্লেজে করে পথ পাড়ি দিতে লাগল। আস্তে আস্তে সবাই দুর্বল হয়ে পড়ছে। পেটে খাবার নেই। পথ চলার শক্তিও যেন ফুরিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে দুএকটা পাখি যা পাওয়া যাচ্ছে তাই মেরে কোনরকমে পেটের ক্ষুধা মিটাচ্ছে ওরা। এভাবে আর ক'দিনই বা চলে! একদিন সবাই এতই কাহিল হয়ে পড়ল যে উঠে দাঁড়াবার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলল, কিন্তু এর একমাত্র ব্যতিক্রম আলটামন্ট। অসম্ভব মনের জোরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন; তারপর ডাককে নিয়ে বের হলেন শিকারে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আলটামন্টের যে মূর্তি দেখা গেল তা কেউ আশা করেনি। দুচোখে রাজ্যের ভয়, চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছেন ওদের দিকে। কাছে এসে ওদেরকে ডেকে নিয়ে আবার ছুটলেন–যেদিক থেকে এসেছিলেন সেদিকে।

কি ব্যাপার!

উত্তেজনায় সবাই দেহে কিছুটা শক্তি ফিরে পেল। ছুটে গেল ওরা আলটামন্টের পেছন পেছন। কিন্তু ওরা জানত না, ওদের জন্যে কি বীভৎস দৃশ্য অপেক্ষা করছে। সবাই দেখতে পেল, বরফে পড়ে আছে বেশ কয়েকটি লাশ। লাশগুলো চিনতে ডক্টর বা অন্য কারও বেশি কষ্ট হল না। এ লাশ শ্যানডন ও তার বিশ্বাসঘাতক সঙ্গীদের। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, মরবার আগে ওরা কামড়াকামড়ি করে একে অন্যের মাংস খেয়েছে। তবুও মৃত্যু এড়াতে পারেনি ওরা। একেই বোধহয় বলে ঈশ্বরের অমোঘ বিধান। বিশ্বাসঘাতকতার যোগ্য শাস্তি!

এর পরের দিনগুলো যে কি কল্পনাতীত দুঃখ কষ্টের মধ্যে কেটেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ডেভিন দ্বীপের প্রান্তে পৌঁছতে লেগে গেল সেপ্টেম্বরের নয় তারিখ। দুদিন আগে শেষ বারের মত খেয়েছে সবাই। কিন্তু কি খেয়েছে ওরা!

কিই বা আছে খাবার? শেষমেষ এস্কিমো কুকুরটাই ওদের আহারে পরিণত হল। একটা কুকুর এতজন ক্ষুধার্তের জন্যে কিছুই নয়। জনসন, বেল দুজনেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কেউই আর চলতে পারছে না।

মৃতপ্রায় অবস্থায় ওরা পড়ে রইল বাফিন উপসাগরের তীরে। অপেক্ষায় রইল যদি বা কোন তিমি শিকারের জাহাজ দেখতে পাওয়া যায়! প্রথমদিন কিছুই নজরে

পড়ল না কারও। পরদিন দূরে দেখা গেল জাহাজের পাল। আশায় বুক বেঁধে সবাই ছুটল সমুদ্রের দিকে। অনেকভাবে চেষ্টা করল ওই জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার, কিন্তু না; জাহাজের কেউই ওদের দেখতে পেল না। আস্তে আস্তে জাহাজ মিলিয়ে গেল দিগন্ত রেখায়।

হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়ল সবাই। কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু ডক্টর। আর একবার কেরামতি দেখালেন তিনি। একটা বড় হিমবাহে উঠলেন সবাইকে নিয়ে। স্লেজের তলা থেকে লোহার পাত খুলে নিয়ে মাস্তুলের মত গাঁথলেন হিমশালায়। তাঁবু ছিঁড়ে পাল বানালেন। বাতাসের ছোঁয়া লাগতেই পাল ফুলে উঠল। হিমশিলা ছুটে চলল নৌকার মত।

একটি ডেনিশ তিমি জাহাজ দেখতে পেল ওদের। জীবন্ত কঙ্কালের মত মানুষগুলো নাবিকেরা তুলে নিল জাহাজে। সেবা-শুশ্রূষা করে ওদের দেহে শক্তি ফিরিয়ে দিল।

তেরোদিনে জাহাজ এসে পৌঁছল লন্ডনে। মেরু অভিযাত্রার ১৭ জনের আলটামন্টসহ ফিরে এল মাত্র পাঁচজন। অভিযাত্রীদের মনে এখন এক মিশ্র অনুভূতি। একটি আনন্দের আরেকটি দুঃখের।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস আর ভাল হয়ে উঠলেন না; পাগলই রয়ে গেলেন। বাকশক্তিও আর ফিরে পেলেন না! চিকিৎসার জন্যে লিভারপুলের এক মানসিক হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করে দিলেন ডক্টর। কিন্তু এতেও কোন পরিবর্তন হল না।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস প্রতিদিন ডাককে নিয়ে হেঁটে যান বিশেষ একদিকে। সেখানে গিয়ে দূরপানে চেয়ে থাকেন, আবার ফিরে আসেন। এই আসা-যাওয়ার কোন শেষ নেই। যেন অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে শান্তির খোঁজে!

পাঠক জানেন কি–কিসের পানে আজও হ্যাটেরাস চেয়ে থাকেন দূর-দিগন্তে?

***